স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ৭ জানুয়ারি - ২০১৩।। ২২ পৌষ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ▯ সিস্টার ক্রিস্টিন ▯ ৭

সহপাঠী বিবেকানন্দ ▯ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ▯ ১১

স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজকের যুবসমাজ ▯ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ▯ ১৩

জাতীয় পুনর্গঠন : স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ ▯ কে সূর্যনারায়ণ রাও ▯ ১৫

এই সময়ের ভারত এবং বিবেকানন্দ ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১৮

বিবেকানন্দের রঙীন আলোকচিত্র ▯ ২১

ধর্মহীন রাষ্ট্র : বিবেকানন্দের সতর্কবাণী ▯ ড: দীনেশ চন্দ্র সিংহ ▯ ২৫

স্বামী বিবেকানন্দের অনেক বক্তৃতার হদিস নেই ▯ গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ ২৭

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সাম্যতত্ত্ব ▯ ড: অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

স্বামীজীর ভাবনায় অধ্যাত্মভিত্তিক রাষ্ট্র ▯ সুরেন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ৩৩

যেমন গুরু তেমন শিষ্য ▯ অর্ণব নাগ ▯ ৩৫

বিবেকানন্দর লেখা বই ও তাঁর সম্বন্ধে লেখা বই আমাদের গৌরবের উত্তরাধিকার ▯ রমাপ্রসাদ দত্ত ▯ ৩৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

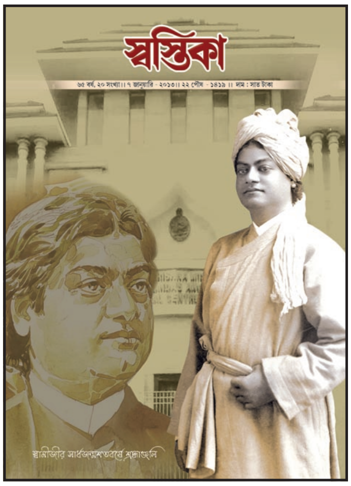

স্বামীজীর সার্ধজন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২২ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ৭ জানুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক

মাননীয় মোহনরাও ভাগবত-এর উপস্থিতিতে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের

বিশাল যুব সমাবেশ

স্থান :— বৃন্দাবনী মাঠ, মালদা

তারিখ :— ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

সময় :— বিকাল ৩.০০টায়

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা

২০১৩ সালের ১১, ১২, ও ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশত বর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নদীয়ার কল্যাণী শহরের উপকণ্ঠে গয়েশপুরে অনুষ্ঠিতব্য বিবেকানন্দ যুব শিবির আক্ষরিক অর্থেই বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। সমাজে এর প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে তাই-ই আমাদের আলোচ্য। রঙিন চিত্র সম্বলিত অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র যুব শিবিরে যোগদানকারীদেরই নয়, প্রতিটি বিবেকানন্দ-অনুরাগী মানুষের কাছেও সংরক্ষণযোগ্য।

।। তারিখের মধ্যে কপি বুক করুন।। মূল্য ১০ টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্র চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতজন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র দেশব্যাপীই শুধু নয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেও উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রস্তুতি চলিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মহামানব স্বামীজীর জীবন-চরিত ও বাণী পুনরায় অধ্যয়ন করিবার জন্য এক নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই মহান শিষ্যই সাম্প্রতিক কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দু পরিব্রাজক, যিনি বহির্বিশ্বে পরিভ্রমণ করিয়া সনাতন হিন্দু ধর্মের বাণী প্রচারের মাধ্যমে পুনরায় বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি শুধু একজন দেশপ্রেমিক, সমাজসংস্কারক ও সংগঠকই ছিলেন না, তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণের শক্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন।

কন্যাকুমারিকায়—দেবী কুমারীর মন্দিরে বসিয়া, ভারতের অন্তিম শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া তিনি ঈশ্বরের নয়, ধ্যান করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের। গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন কেন ভারত গৌরবের সমুচ্চ শিখর দেশ হইতে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে। ভারতের সামাজিক আইন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রাথমিক স্তরে এই সমস্ত আইন বিরাট পরিকল্পনার উৎস ছিল, এই সমস্ত চিন্তার উৎস বহুকাল পরে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতের ঋষিকুল এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন যে পৃথিবীর লোকেদের পক্ষে তাঁহাদের প্রতিভার মর্ম বুঝিতে এখনও বহু শতাব্দী লাগিবে। তাঁহাদের সন্ততিবৃন্দ এই অদ্ভুত পরিকল্পনার সম্পূর্ণ কার্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; এইজন্য এবং কেবলমাত্র এইজন্য ভারতের এই অধঃপতন। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের আইন ও রীতিনীতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলিয়াই যে ভারতের অধঃপতন হইয়াছে তাহা নহে, বস্তুত সেই সকল আইন ও রীতিনীতি হইতে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তে আসিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে তো জগৎ হইতে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হইয়া যাইবে, সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হইবে, ধর্মের প্রতি সমস্ত মধুর সহানুভূতির ভাব চলিয়া যাইবে; সবরকম আদর্শবোধ নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই অন্তিম শিলাখণ্ডে বসিয়া স্বামীজী দিব্য দৃষ্টিতে ইহাও দেখিয়াছিলেন— ভারত আবার উঠিবে এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়াই উঠিবে। স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামীজীর কাছে ভারত শুধু জন্মভূমি, মাতৃভূমি মাত্র নয়, পুণ্যভূমিও। কারণ ভারত ঋষির দেশ, সেইসব মানুষের দেশ যাঁহারা সত্যের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন। স্বামীজী ভারত-কেই 'সত্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ভারতের মৃত্যু হইলে সত্যের মৃত্যু ঘটিবে, ধর্ম লোপ পাইবে, সমস্ত উচ্চ চিন্তা মুছিয়া যাইবে। শুধু ভারতের জন্য ভারতের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নয়, বিশ্বের জন্য ভারতের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এক একটি বিধিনির্দিষ্ট পথে যাইতে হয়, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এক ব্রতবিশেষের উদযাপন করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই আমাদিগকে জানিতে হইবে রাষ্ট্র বা জাতি ও ব্রত কি, জানিতে হইবে বিধাতা এই জাতিকে কি করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রগতিতে ইহার স্থান কোথায়, জানিতে হইবে বিভিন্ন জাতির সংগীতের ঐকতানে তাহাকে কোন্ সুর বাজাইতে হইবে।

ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য যে মূল সূত্রটি স্বামীজী বহুবার বহুভাবে বলিয়াছেন তাহা হইল— রাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যন্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নয়; ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের প্রাধান্য ভারতে চিরকাল। ধর্মই ভারতের আত্মা। আমরা হিন্দু। হিন্দু বলিতেছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হইতেছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য। ধর্ম-ই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি। হিন্দুরা ধর্মের ভাবে আহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে চলাফেরা করিয়া থাকে, ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত করে। এই ধর্মের উপর হাত পড়ে নাই বলিয়া হিন্দুজাতি এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে। বস্তুত সর্বদেশে সর্বকালে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যও এই ধর্ম। হিন্দুরাই যেহেতু এই ধর্মের আবিষ্কর্তা এবং হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ইহা পুষ্ট করিয়া আসিতেছে, তাই ইহার অপর নাম হিন্দুত্ব। বস্তুত হিন্দুরা যাহা করে এবং ভাবে তাহাই হিন্দুত্ব, তাহাই এই দেশে রাষ্ট্রীয়ত্ব। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতও এই হিন্দুত্বকেই 'ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড কমন কালচার অফ ইন্ডিয়া' বলিয়া রায় দিয়াছেন। তাই যখনই সে নিজ পূর্বপুরুষদিগের এই ভাবকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইবে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন। স্বামীজী বলিয়াছেন, ''এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির— আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া

পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।”

এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে চিকাগোতে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামীজী বিশ্ব-সংস্কৃতির আধুনিক মানচিত্রে হিন্দুধর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে পাশ্চাত্যের সভ্য জাতিগুলি হিন্দুধর্মকে অত্যন্ত হেয় দৃষ্টিতে দেখিত। তাহারা মনে করিত যে হিন্দুধর্ম কুসংস্কার, দুরাচার এবং নীতিহীন লোকাচারের সমষ্টি এবং বর্তমান প্রগতিশীল জগতে হিন্দুধর্ম কোনওরকম গুরুত্ব লাভ করিবার দাবী রাখিতে পারে না। স্বামীজীর ব্যাখ্যার ফলে এই প্রথম তাহারা হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাইল—শুধু তাহাই নয়, বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মকে তাহারা অত্যন্ত উচ্চ আসন প্রদান করিল। ইহার সুদূরপ্রসারী প্রত্যক্ষ প্রভাব হিন্দু জাতির উপর কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

এযাবৎ হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যখনই কোনও তুলনামূলক বিচার হইয়াছে তখনই শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদাই একটা আত্মরক্ষামূলক এবং ক্ষমাপ্রার্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতি নিম্নমানের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই প্রবল দাবী ভারতীয়রা প্রায় সত্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। এখন আকস্মিকভাবেই পট-পরিবর্তন হইয়া যাওয়াতে পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিরা একযোগে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা হিন্দুদের শত্রু-মিত্র কেহই কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। স্বামীজী আমাদের বুঝাইয়াছিলেন যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহার একটি চিরন্তন মূল্য আছে এবং তাহা শুধু ভারতের জন্যই নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য। ইহার ফলে হিন্দু জাতির মধ্যে তাহাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান ও দেশাত্মবোধের চেতনাও দ্রুত জাগরিত হইয়া উঠিল। হিন্দু রাষ্ট্রীয়তা বোধের জাগরণের ক্ষেত্রে ইহা ছিল এক বিরাট অবদান।

এই রাষ্ট্রীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে হইলে এক হস্তে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্তে অন্যান্য জাতির নিকট হইতে যাহা শিখিবার তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। শর্ত একটাই— সেইগুলিকে হিন্দুরাষ্ট্রের জীবনশৈলীর মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে। তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্বমহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। সামরিক শক্তি বলে নহে, অন্যান্য রাষ্ট্রকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া নহে, ভারত ভারত হিসাবেই আবার উঠিবে। স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে—‘‘বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, প্রেমের পতাকা লইয়া সন্ন্যাসীর গৈরিক-বেশ সহায়ে।”

ইহা অনেকাংশে ঠিক, স্বাধীনোত্তর ভারত দুর্নীতি ও মূল্যবোধহীনতায় জর্জরিত, ‘সেকুলারিজম’-এর মোড়কে কিছু রাজনৈতিক দল ও এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত। তবুও স্বামীজীর বাণী যে মিথ্যা নহে তাহার আভাস আমরা লক্ষ্য করিতেছি। অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভারত আজ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা তীব্র গতিশীল গণতান্ত্রিক দেশ। ভারত তাহার মহান স্বাভিমান ও অস্মিতা রক্ষায় যে ঘুরিয়া দাঁড়াইবার প্রচেষ্টা করিতেছে সাম্প্রতিক অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণের আন্দোলন তাহার প্রমাণ। বর্তমান ভারত বিশ্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। স্বামীজীর ঋষিদৃষ্টি সত্য। ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

নির্ভয়া দামিনীর মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যু হইয়াছে মনুষ্যত্বের। দেশের বিবেককে আঘাত দিয়াছে এই ঘটনা। শোক, ক্ষোভ আর প্রতিবাদে মৌন-মুখর সমগ্র দেশ। জাগাইয়া দিয়াছে বহু তরুণ তরুণীকে। সুশীল সমাজের যে আশ্চর্য সচেতনতা ও ঐক্য দেখা গিয়াছে, তাহা যাহাতে বৃথা না যায় দেখিতে হইবে। সরকারের ‘ধীরে চলো’ নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত, যাহাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ করিতে কেহ সাহস না করে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি

সিস্টার ক্রিস্টিন

বহু যুগ পর পর আমাদের মধ্যে এমন এক মহাপ্রাণ আবির্ভূত হন যাঁকে কোনওমতেই এই পৃথিবীর মানুষ বলা চলে না। তিনি সম্পূর্ণভাবেই অদৃশ্য অন্যলোকের বাসিন্দা; যেন পথ চলতে চলতে হঠাৎই এই ধূলিধূসরিত মাটির পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। এহেন অমৃতপথযাত্রী যখন বেদনাদীর্ণ এই ধরণীতে নেমে আসেন, তখন নিয়ে আসেন তাঁর আপন ভুবনের দীপ্তি, শক্তি ও দিব্য মহিমা। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন— তিনি এ জগতের নন। তিনি জানেন— তিনি এক আগন্তুক। তীর্থযাত্রী মাত্র। রাত ফুরালেই চলে যাবেন।

তাঁর চারপাশে যারা থাকে, তিনি তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নেন। তাদের সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথী। কিন্তু এই নিবিড় একাত্মতা সত্ত্বেও তিনি কখনও আত্মবিস্মৃত হন না। ভোলেন না তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন। তাঁর অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ এই মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে--- আমি মহামহিমময়, সর্বব্যাপী, অখণ্ড আত্মা। তিনি জানেন, যে অনির্বচনীয় দিব্যধাম থেকে তাঁর অবতরণ, সেখানে সূর্য, চন্দ্র কিছুই নেই; তার প্রয়োজনও নেই, কেননা সেই ধ্রুবলোক নিত্য জ্যোতির্ময়, যিনি সকল আলোর উৎস। তিনি এও জানেন তিনি কালাতীত। একদা যখন সব দেবশিশু আনন্দে গান গেয়ে উঠেছিলেন— তারও বহু আগে থেকেই তিনি আছেন। তিনি নিত্য-বর্তমান।

কাশ্মীরে (বাঁ দিক থেকে) জয়া, ধীরামাতা, স্বামীজী ও নিবেদিতা।

ঠিক অমনই একজনকে আমি চাক্ষুষ দেখেছি, তাঁর বাণী স্বকর্ণে শুনেছি এবং আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি সবই তাঁর পাদপদ্মে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছি। তিনি এমনই একজন যাঁর সাথে কারও তুলনা চলে না। তিনি অতুলনীয়, কারণ বিচারের সাধারণ মাপকাঠি ও আদর্শের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি। অন্যেরা বড় জোর উজ্জ্বল; কিন্তু তিনি জ্যোতির্ময়। কারণ, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে সত্তা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার শক্তি তাঁর ছিল। সাধারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তাকে পর্যায়ক্রমে, ধীরে ধীরে সেই জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু তিনি এই সাধারণ নিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট নন। অন্যেরা বড় হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব আপেক্ষিক। কারণ সমশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তুলনামূলকভাবেই তাঁদের মহত্ত্ব নিরূপিত হয়। অন্যেরা সমাজের আর পাঁচজনের চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল, অনেক প্রতিভাবান, অনেক শক্তিধর হতে পারেন এ কথা সত্য। এ কথাও অনস্বীকার্য একজন যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র, সত্যবান এবং একনিষ্ঠ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনা চলে না। তাঁর দৃষ্টান্ত তিনিই। তিনি অনুপম। সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এ জগতের মানুষ ছিলেন না তিনি। ঊর্ধ্বলোক থেকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর মতো জ্যোতিরাত্মার মর্তে আগমন। তাই এটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল— এই ধরণীতে

তিনি ক্ষণিকের অতিথি। ধন্য সেই দেশ যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ধন্য তারা যারা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন আর মহাভাগ্যবান তারা যারা তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পেয়েছিলেন।

গুরুদেব এবং তাঁর বাণী

একটা সময় থাকে যখন আমাদের জীবনটা একঘেয়ে ছকে বাঁধা থাকে; অগভীর ঘোলা জলের নদীর মতো, মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে চলে তো চলেই! আহার, নিদ্রা আর অর্থহীন প্রলাপ— এই সে জীবনের সার। চিরাচরিত চিন্তা আর অসার ভাবকে কেন্দ্র করেই জীবনটা ঘুরপাক খায়। শোক, তাপ, বিপর্যয় এসে মাঝে মাঝে আমাদের স্তব্ধ করে দিয়ে যায় বটে, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যেই। তারপর আবার যে সেই! কারণ আমরা স্থির থাকতে পারি না। সুখ বা দুঃখ দুয়ের কোনওটাই জীবনের এই ঘুরন্ত নাগরদোলাকে থামাতে পারে না। কিন্তু একথা ধ্রুবসত্য— এ-ই জীবনের সব নয়, সব হতে পারে না। কারণ এইভাবে দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরতে আমরা এ জগতে আসিনি। একদিন এই বোধ আমাদেরও আসে, আর যখনই আসে তখনই এক নিদারুণ অতৃপ্তি পেয়ে বসে আমাদের। আমরা যন্ত্রণায় ছটফট করি। বুঝতে পারি না সমগ্র জীবন ধরে আমরা কি অন্বেষণ করছি! জীবন-বাসর সাজিয়ে এ কার, কিসের প্রতীক্ষা? তারপর একদিন আসে সেই শুভদিন, সেই বহুবাঞ্ছিত মাহেন্দ্রক্ষণ যখন দারুণ বিস্ময়কর কিছু ঘটে যায় এমন কিছু যার জন্য জন্ম জন্ম ধরে আমাদের শবরীর প্রতীক্ষা, এমন কিছু যা বারোমেসে ভ্যাপসা জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত করে আমাদের সমগ্র জীবনপ্রবাহকে এক নতুন খাতে বইয়ে দেয়। জীবনধারার সেই অভূতপূর্ব তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কেউ চলে যায় দূর কোনও এক অচিন দেশে, যেখানে সব নতুন মানুষ। তাঁদের রীতি-নীতি, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি—সব আলাদা; কিন্তু এমন মানুষ যাঁদের দেখামাত্রই পরম আপনার বোধ হয়, এমন অদ্ভুত মানুষ, যাঁরা জানেন জীবনের উদ্দেশ্য কি! স্বভাবতই, পরম প্রাপ্তির এই লগ্নে আমাদের সব অস্থিরতা চিরতরে ঘুচে যায়। আমরা শান্ত হই।

বহু, বহুজন্ম পর, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ, সংগ্রাম এবং ছোটখাটো জয়ের পর আসে অভিপ্রেত সিদ্ধি। কিন্তু ক্রমোন্নতির এই সূক্ষ্ম ধারাটি বুঝতে বেশ সময় লাগে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য এই— একটা ছোট বীজই কালে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়। সমতল জমির প্রান্তে মাত্র কয়েক ফুট উঁচু তটভূমিই বিশাল নদীর গতিপথ নির্ধারণ করে, দেয় সে উত্তরবাহিনী হয়ে মেরুসাগরে পড়বে কি দক্ষিণবাহিনী হয়ে কৃষ্ণসাগর অথবা ক্যাসপিয়ান সাগরে পড়বে। ঠিক তেমনি ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক হিমেল রাতে ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটেরিয়ান চার্চে একটি বক্তৃতা শোনার জন্য যখন পথে বেরিয়েছিলাম, তখন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না এই যাত্রাই আমার জীবনের জয়যাত্রা, এই যাত্রাই আমার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণভাবে পালটে দেবে এবং সেই পরিবর্তনের মূল্যায়ন আমার অতি পরিচিত গতানুগতিক বিচারের মাপকাঠিতে অসম্ভব! সত্যি বলতে কি, বক্তৃতা যে প্রাণে বেজেছে তা হাতে গোনা যায়। সবই শোনা কথা--- এবং সেসব কথা মনে কোনও উচ্চভাব জাগায় না। বিশেষ করে সেবার শীতে ডেট্রয়েটে যেসব বক্তা এসেছিলেন, তাঁরা একেবারে অসম্ভব পীড়াদায়ক এবং ক্লান্তিকর। তাঁদের কথাবার্তা এতটাই হতাশ করেছিল যে আর নতুন কিছু শোনার আশা আমরা প্রায় জলাঞ্জলিই দিয়েছিলাম বলা চলে। বক্তৃতার কথায় তখন যেন আমরা আঁতকে উঠতাম। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েই এবং শুধুমাত্র বান্ধবী মেরি. সি. ফাঙ্কির অনুরোধেই সেদিন আমি 'ভারতীয় সন্ন্যাসী Vivekananda'-র বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। ফাঙ্কি ছিল নিরতিশয় আশাবাদী। সে কখনও হতাশ হোত না। আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে সে তার বিশ্বাস আঁকড়ে থাকত--- একদিন না একদিন 'আকাঙ্ক্ষিত বস্তু' মিলবেই।

মনের এই অবস্থা নিয়েই আমরা ভারতীয় সন্ন্যাসীর ভাষণ শুনতে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের পূর্ব পূর্ব কোটি জন্মেও আমরা এ রকম একটা সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিইনি। নিতে পারিনি। কারণ মিনিট পাঁচেক বক্তৃতা শোনার পরই আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করলাম, যে পরশমণির সন্ধানে এতকাল ব্যাকুল হয়ে ফিরেছি, সেই অমূল্যধন আমাদের চোখের সামনে! আমাদের দুজনার হৃদয়ের ভারই যেন একসঙ্গে নেমে গেল। দুজনের মুখেই ফুটে উঠল একই অভিব্যক্তি : 'ভাগ্যিস এসেছি, নইলে...।'

যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের চেহারার কথা খুব শুনেছেন, তাঁরা হয়তো আমার এই কথায় খুব অবাক হবেন— স্বামীজীর যে জিনিসটি আমায় প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল, সেটি তাঁর রূপ নয়। চেহারা নয় সেটি মন। পাশ্চাত্যের মানুষ সাধারণত ভাবেন সাধু-সন্ত এবং আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেই বুঝি হাড়-জিরজিরে হবেন। কিন্তু তেজোদৃপ্ত, ওজস্বী, ভারতীয় সন্ন্যাসী যখন বক্তৃতামঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন দেখা গেল—সে ধারণা সর্বৈব সত্য নয়। দীর্ণ-শীর্ণ চেহারার সাধু সকলেই কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু এমন সাধুর কথা কে শুনেছে যাঁর দেহে বজ্রের শক্তি? বাস্তবিক, এই অনন্য সাধারণ পুরুষের ভেতর থেকে এমন মহাতেজ ক্ষরিত হচ্ছিল যে উপস্থিত সকলেই একেবারে কুঁকড়ে গেলেন। সেই দুর্নিবার তেজের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় সাধ্য কার? স্বামীজী বক্তৃতামঞ্চে আসার সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই সকলে এই শক্তির স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। পরে অবশ্য আমরা এই শক্তির খেলা দেখে ধন্য হয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, স্বামীজীর মন, চিন্তা, এককথায় তাঁর অন্তর্জগতের আকর্ষণটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। কি আশ্চর্য মননশীলতা! কি অভাবনীয় সব চিন্তা! এমন কোনও শব্দ আমার জানা নেই যা দিয়ে তাঁর সেই মনের ব্যাপ্তি, দীপ্তি, বা অলোকসামান্যতার সামান্যতম আভাসও দিতে পারি! অন্যেও কি তা পারেন? পারেন না। কারণ, তাঁর মন আর পাঁচজনের, এমনকি যাঁরা প্রতিভাবান বলে সুখ্যাত, তাঁদের সকলের মনের চেয়েও এতটাই উচ্চভূমিতে বিরাজ করত যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠনটিই ছিল একবারে আলাদা। সেই অনন্য মনের

চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট, এত বলিষ্ঠ এবং এতটাই অতীন্দ্রিয় যে তা কোনও স্থূলদেহীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার এই যে অভিনবত্ব, অসাধারণ সূক্ষ্ম মানসিক ভাবতরঙ্গের নিরন্তর প্রক্ষেপণ—তা সত্ত্বেও বলবো, তাঁর সবকিছুই আমার বড় আশ্চর্যরকম- ভাবে আপনার বলে বোধ হয়েছিল। যেন এসব কিছুর সাথে আমি বহুকাল পরিচিত। নিজের মনেই তাই বলে উঠলাম, 'এই মনটি আমার খুব চেনা।'

তরল সোনা সংহত সূর্যরশ্মির আভায় যেমন রক্তবর্ণ হয়ে উঠে, স্বামী বিবেকানন্দও সেই প্রদীপ্ত, সমুজ্জ্বল রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। সুদূর ভারত থেকে আগন্তুক এই প্রচারকের বয়স এখনও তিরিশ ছোঁয়নি। কালাতীত তারুণ্যের প্রতীক যেন, অথচ শাশ্বত প্রজ্ঞায় প্রবীণ। ভারতের সনাতন বাণী—আত্মার কথা, যা আমাদের প্রকৃত পরিচয়, সেই মহা সত্য আমরা তাঁরই মুখ থেকে প্রথম শুনলাম।

তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে ঝলমলে বহুরঙবিশিষ্ট সুন্দর একখানি কাশ্মীরী শাল বুনছেন, আর শ্রোতারা চিত্রার্পিত হয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর সেই শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখে যাচ্ছেন। কত রকমের সুতোই না তাঁর হাতে। কখনও কৌতুকের সুতোটি ধরে টান দিচ্ছেন, কখনও বিষণ্ণতার, কখনও আশার, উচ্চ আদর্শের, আবার কখনও বা গম্ভীর তত্ত্বের। কিন্তু যে রঙের সুতোই টানুন না কেন, পোড়েনে, অর্থাৎ সব কথার ভিতরেই অনুস্যূত হয়ে আছে ভারতীয় অধ্যাত্ম জগতের শুদ্ধতম চিন্তা মানুষের দেবত্ব, তার অন্তর্নিহিত নিত্য শুদ্ধ স্বরূপের কথা। এই শুদ্ধত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করার বস্তু নয়। এই শুদ্ধত্ব নিত্য সত্য। 'তত্ত্বমসি'। তুমিই সেই। তুমি এখনই সেই সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছ। এবং শুধু সেই সত্তাটিকে উপলব্ধি করা ছাড়া তোমার আর করণীয় কিছুই নেই। সেই উপলব্ধি তোমার এই মুহূর্তে, এক নিমেষেই হতে পারে, আবার দশলক্ষ বছরও লাগতে পারে। কিন্তু— 'সত্যের সেই স্বর্ণশিখরে সকলেই একদিন না একদিন পৌঁছবে'— এই বাণীকে সঙ্গত কারণেই আত্ম-দর্শন বলা হয়। এই তত্ত্বের সারাৎসার এই : আমরা নিজেদের অসহায়, খণ্ডিত, সীমিত ভেবে দুঃখকষ্ট পাই; অথচ জানি না আমরা অজয়, অমর, অবিনাশী আনন্দের সন্তান। আমরা দেবশিশু।

প্রাচীন আচার্যদের মতো তিনিও নীতি-শিক্ষামূলক বেশ কয়েকটি গল্প বললেন। কিন্তু গল্প যাই হোক, প্রতিপাদ্য একটাই— মানুষের স্বরূপ। আমরা আসলে নিজেদের যা ভাবি, তা আমরা নই। আমরা নিজেদের খাটো করে দেখি। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন আমরা কি, আমরা কে? তিনি নানা রূপকের মধ্য দিয়ে এই সত্যই তুলে ধরলেন— আমাদের পায়ের তলায় সোনার খনি, কিন্তু আমরা নিজেদের গরিব ভেবে মরছি! আমাদের দুরবস্থা সেই সিংহ-শাবকের মতো, যে ভেড়ার পালের মধ্যে জন্মে নিজেকে ভেড়াই ভাবত। ফলে নেকড়ে দেখলেই সে ভয়ে ভ্যা ভ্যা করত! নিজের সত্যিকারের পরিচয় সে জানতো না। একদিন একটা সিংহ ওই শাবকটিকে ভেড়ার পালের মধ্যে ভ্যা ভ্যা করতে দেখে অবাক হয়ে গেল। সিংহটি বুঝল তাকে দেখেই শাবকটি ভয়ে ওই রকম চিৎকার করছে। তখন সে সিংহ-শাবকটিকে কাছ ডেকে বলল : 'তুই ভেড়া নোস্। তবুও ভয়ে ওই রকম ভ্যা ভ্যা করছিস কেন? তুই তো সিংহ। তোর আবার আমায় দেখে ভয় কি?' তখন সিংহ-শাবকটি বুঝতে পারল— তাই তো! আমি তো ভেড়া নই! আমি সিংহ! যেই না এই কথা বোঝা, অমনি বন কাঁপিয়ে সে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল।

ইউনিটেরিয়ান চার্চে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী সেদিন অধ্যাত্মজগতের মহান সত্যগুলি এমন স্বরে অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, যে স্বর আগে কেউ কখনও শোনেনি। অশ্রুতপূর্ব সেই কণ্ঠ নানাভাবে ছন্দিত হয়ে তাঁর মনের নিগূঢ় ভাবগুলি ব্যক্ত করছিল। কখনও তাঁর কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর এমনভাবে ঝংকৃত হচ্ছিল যার দোলা লাগছিল শ্রোতাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে— তাদের বুকের ভেতরটা থেকে থেকেই মোচড়ে উঠেছিল। যখন তারা বেদনায় মুহ্যমান, তখনই স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটত, তাতে ফুটে উঠত উচ্ছল খুশির ভাব। কিন্তু সেই ভাব স্থায়ী হতে না হতেই আবার বজ্রগম্ভীর

যেদিন তাঁকে 'ভারতবর্ষ'— এই শব্দটি তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে প্রথম উচ্চারণ করতে শুনি, আমার মনে হয়, সেই দিনই আমাদের ভারত-প্রেমের উন্মেষ। মাত্র পাঁচ অক্ষরের একটি শব্দের ভিতর যে এতো ভাব থাকতে পারে, তা যেন বিশ্বাসই হয় না! তাতে ছিল ভালবাসা, আবেগ, গৌরববোধ, সুতীব্র ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, বিষাদ, বীর্যবত্তা, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা এবং সব ছাপিয়ে, ভালবাসা আর ভালবাসা!

বিষাণে ধ্বনিত হোত জেগে ওঠার উদাত্ত, আকুল আহ্বান। তখনই সকলে নড়েচড়ে বসতো। তাঁর কণ্ঠস্বর যে না শুনেছে সে বুঝবে না সঙ্গীত জিনিসটা কি! সুকণ্ঠ কাকে বলে! আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর মুখে ভারতবর্ষের এই সনাতন মর্মবাণী শুনেছেন— 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।' (হে অমৃতের পুত্রগণ; তোমরা শোনো, এমনকি যাঁরা দিব্যধামবাসী তাঁরাও শুনুন, আমি সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ পরম পুরুষকে জেনেছি শুধুমাত্র যাঁকে জানলেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। মুক্তির বা পরিত্রাণের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।)— অথবা আত্মবিস্মৃত সিংহ-শাবকটির গল্প শুনেছেন, তাঁরা প্রাণের গভীরে যে বিপুল নাড়া খেয়েছিলেন সে স্মৃতি কোনদিনও কি তাঁরা ভুলতে পারবেন? পারবেন না। সত্যের এমনই জোর। তুমি যতই ভ্যা ভ্যা কর, নিজেকে দুর্বল ভেবে মিথ্যা ভয় পাও, তবুও তুমি মেষ নও। তুমি বরাবরই সিংহ ছিলে, এখনও তা-ই আছ— অমিতবিক্রম, নির্ভীক পশুরাজ। 'আমি মেষ'--- এই মিথ্যা কল্পনাটিকে শুধু তোমার ত্যাগ করতে হবে। তাহলে এই মুহূর্তেই তুমি বীরকেশরী। 'তত্ত্বমসি'।

স্বামীজীর এই কথাগুলির ভিতর এমন একটা সূক্ষ্ম-শক্তি ছিল যা শ্রোতার মনকে এক উচ্চতর, শুদ্ধতর চেতনার রাজ্যে তুলে দিত। যার ফলে, একবার যে স্বামীজীর কথার স্বাদ পেয়েছে, তার পক্ষে আর গড্ডলিকায় গা ভাসান সম্ভব হোত না। তার নবজন্ম হোতই হতো। তার দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ সবই পালটে যেত। এইভাবে শ্রোতার মনে তিনি আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে দিতেন। ধীরে ধীরে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর এবং কালে সেই অঙ্কুর ফলে, ফুলে সুশোভিত এক সার্থক বনস্পতিতে পরিণত হোত। আত্মজ্ঞানের এই দিব্যবাণী সুপ্রাচীন— তাতে সন্দেহ নেই। এটা ধরে নিলাম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুই এই তত্ত্বের সাথে পরিচিত এবং তাঁদের মধ্যে কারও কারও ধারণা এই বিষয়ে স্পষ্টতর। কিন্তু বিবেকানন্দের মতো কেউই অত জোরের সাথে, নিজের বুক চিরে সেই তত্ত্বের সত্যকে জগতের কাছে উন্মোচিত করেননি। তাঁর কাছে তত্ত্ব আন্দাজে-ঢিল-ছোঁড়া পণ্ডিতি কচ্‌কচি ছিল না। তত্ত্ব ছিল তাঁর কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জীবন্ত সত্য। আর সব কিছু অসার, অনিত্য হলেও ওই তত্ত্ব ছিল তাঁর কাছে একমাত্র নিত্য সত্য। শুধু বিশ্বাসের জোরে নয়, ওই অনুপম তত্ত্বকে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অভ্রান্ত ওই উপলব্ধির পর তাঁর জীবনের একটাই উদ্দেশ্য--- মনুষ্য জীবনের ওই চরম লক্ষ্যপথে অন্যদেরও সাহায্য করা। তাই তাঁর আহ্বান : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না চরম লক্ষ্যে পৌঁছাও, এগিয়ে চল। থেমো না।"

তাঁর বক্তৃতার অবিস্মরণীয় সেই প্রথম একটি ঘণ্টায় তিনি এমনভাবে আমাদের মনগুলিকে তাঁর আপন চৈতন্য সত্তার সঙ্গে এক ভূমিতে তুলে দিলেন যে ওই দুরূহ তত্ত্বের কিছুটা যেন তখনই আমরা অনুভব করতে পারলাম। পরে ধীরে ধীরে, বহুকষ্টে, সংগ্রাম ও নিরন্তর প্রচেষ্টার পর আমাদের কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছিল— আমাদের মনটাই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একেই বলে গুরুকৃপা।

যাঁরা ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতায় এসেছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তৃতায় না এসে পারলেন না। তাঁরা তো এলেনই, সঙ্গে করে তাঁরা তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়দেরও এই বলে নিয়ে এলেন : 'চলুন, একজন মহাপুরুষের কথা শুনবেন তো চলুন। তাঁর মতো কথা এর আগে আমরা কারও মুখ থেকে শুনিনি।' ফলে, দলে দলে বহু নতুন শ্রোতাও উদ্গ্রীব হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এলেন। ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। এত শ্রোতা যে ঘরে আঁটলো না। বহু লোক, সারিবদ্ধ আসনের মাঝখানে চলাচলের যে পথ থাকে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বহু শ্রোতা আবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে স্বামীজীকে দেখতে থাকলেন।

স্বামীজী তাঁর মূল বক্তব্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং কখনও রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান, কখনও বিভিন্ন পুরাণ ও লোকগাথার সাহায্যে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে প্রাঞ্জল করে তুললেন। উপনিষদ্ থেকেও তিনি অনর্গল উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন। প্রথমে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করলেন, পরে সুললিত ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করে দিলেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা শ্রোতাদের তো মুগ্ধ করেছিলই, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, তার ধ্বনি ও ছন্দ-মাধুর্য তাঁদের আরও বেশি আবিষ্ট করেছিল, নাড়া দিয়েছিল তাঁদের মর্মমূলে। তাঁরা উপনিষদের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেলেন।

যেদিন তাঁকে 'ভারতবর্ষ'— এই শব্দটি তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে প্রথম উচ্চারণ করতে শুনি, আমার মনে হয়, সেই দিনই আমাদের ভারত-প্রেমের উন্মেষ। মাত্র পাঁচ অক্ষরের একটি শব্দের ভিতর যে এতো ভাব থাকতে পারে, তা যেন বিশ্বাসই হয় না! তাতে ছিল ভালবাসা, আবেগ, গৌরববোধ, সুতীব্র ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, বিষাদ, বীর্যবত্তা, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা এবং সব ছাপিয়ে, ভালবাসা আর ভালবাসা! শত শত গ্রন্থ রচনা করেও অন্যের মধ্যে এমন সর্বগ্রাসী ভাব সঞ্চারিত করা যায় না। কিন্তু ওই নামের এমনই জাদু, যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই মজেছেন। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' এবং তারপর থেকে চিরদিনের জন্য 'ভারতবর্ষ' তাঁদের অন্তরের ধন হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সব কিছুই তখন তাঁদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ওঠে— তার মানুষ, তার ইতিহাস, তার শিল্পকলা, রীতিনীতি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমতল, তার কৃষ্টি, তার আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা, এমন কি তার ধর্মশাস্ত্রগুলি পর্যন্ত জীবন্ত বোধ হয়। তারা যেন কানে কানে কথা বলে ওঠে! ফলে, শুরু হয় নতুন জীবন--- ধ্যান ও ধারণার। অনুশীলন ও অনুধ্যানের। সমগ্র জীবনের রূপরেখাটিই পাল্টে যায়।

(লেখিকা স্বামীজীর শিষ্যা)

সহপাঠী বিবেকানন্দ

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইংরেজী ১৮৭৯, ষোল বছরের ছেলে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে বুথ সাহেবের অঙ্কের ক্লাসে দেখলাম! পরিচয়ের ঘটক শশীভূষণ বসু— আমার বন্ধু— ওই কলেজেরই ছাত্র, অঙ্কে খুব ভাল, অধ্যাপকের পরম প্রিয়। তাছাড়া শশীর গানের চর্চা ছিল বলেই নরেনের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা। বুথ তখনকার দিনের খ্যাতনামা গণিত-বিশারদ, কেমব্রিজের র‍্যাংলার। অন্য কলেজের ছাত্রদেরও নিজের ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন। সেজন্যই আমি মেট্রোপলিটান কলেজের এফ এ-র ছাত্র হলেও ওখানে আমার রোজ বেলা দুটোর পর গতিবিধি। নরেন প্রথম বার্ষিক-এ প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন, দ্বিতীয় বার্ষিক-এ জেনারেল এসেমব্লিজে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) গেলেও বুথের ক্লাসে যোগ দিতেন। তাছাড়া নরেন ও শশী (শশীভূষণ বসু) হেয়ার স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলেন।[১]

শশীর ভবানীপুরের বাড়িতে নরেন ও আমি যেতাম। শশীর পিতা আমাদের ভালবাসতেন। কলেজ পাড়ায় তিনজনে মিলে গোলদিঘিতে রাত্রি নটা-দশটা পর্যন্ত গল্প-গান চলত। গাইতে না জানলেও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলাম। ক্রমে নরেন্দ্র ব্রাহ্মভাবাপন্ন হলেন। আর আমার তখন স্বদেশসেবার দিকে ঝোঁকের জন্য তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটল।[২]

পরমহংসদেবের তিরোধানের দু-তিন বৎসর পরে আমি বরাহনগর রামকৃষ্ণ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। তখন স্বামীজী পরিব্রাজক, ওখানে নেই। ওখানে সাধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য জল তোলা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া ও অন্যান্য কাজ করে তৃপ্তি পেতাম। পরে মহেন্দ্র মাস্টারমশায় ও দক্ষ মহারাজ আমাকে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে নিয়ে যান। গোঁসাইজী আমার ভিন্ন মার্গগামী মনকে

ধর্মমার্গে আনয়ন করেন। তারপর একেবারে কাশীপুরে এক বাগানবাড়িতে (গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে) স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর তখন অন্যমূর্তি। বাইরের দুনিয়া-ফেরত জগদ্বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। একটা বৃহৎ হলঘর। একশো আন্দাজ লোক সেখানে উপস্থিত। প্রতীচ্যের ভক্তেরাও ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সকলের ধর্মালোচনা চলছিল। আমি ঢুকছি দেখেই স্বামীজী তাঁর চেয়ার ছেড়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা কৌচে নিজের অতি কাছে বসালেন এবং সেই পূর্বকালের নরেন্দ্রনাথের মতো (মাঝে যেন কোন কিছুই ঘটেনি) ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে বালকের মতো আলাপ করতে লাগলেন।

অত লোকের মধ্যে তাঁর প্রতি আমি সম্ভ্রম প্রকাশ করলাম দেখে স্বামীজী অতি সহজভাবে বললেন, ‘‘কে কি মনে করবে? ও কিছু নয়।’’ পরে আমার পরিচিত একটি মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় (সে ছাত্র এখন একজন প্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ) স্বামীজী অম্লানবদনে হেসে বললেন, ‘‘Is he a fanatic?’’ আমি বললাম, ‘‘No’’. তখন উত্তর করলেন, ‘‘Then I have no need of him— তাকে আমার দরকার নেই।’’ ‘ফ্যানাটিক’ অর্থে তেজীয়ান যুবক— ধর্মের বা দেশের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত কিনা— এইভাবে রহস্যপূর্বক শব্দটি ব্যবহার করলেন। স্বামীজী আমাকে দেশের কাজে অধিক যোগ্য হবার জন্য আমেরিকা জাপান পাঠাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় তা সম্ভবপর হয়নি।

---

১. নরেন্দ্রনাথের হেয়ার স্কুলে পড়ার কথা জীবনীতে নেই। তথাপি তার সম্ভাবনা রয়েছে। একবার মেট্রোপলিটান স্কুলে বদরাগী মাস্টারের চপেটাঘাত ও

কানমলা খেয়ে, যাতে প্রচুর রক্তপাত হয়, তিনি অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাফ বলেছিলেন, ‘‘মশাই, আপনার এ স্কুলে আর পড়ব না।’’ হয়তো রাগ করে কিছুদিনের জন্য পাড়ার স্কুল ছেড়ে বেপাড়ায় হেয়ারে গিয়ে থাকবেন। —স্বামী নির্লেপানন্দের সংযোজন।

২. সতীশচন্দ্রের ‘লাইট অব দি ইস্ট’ ইংরেজী পত্রিকায় ১৮৯৪ জানুয়ারি সংখ্যায় শিকাগো ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ লেখা বের হয়। লেখাটি ‘জীরো’ ছদ্মনামে রচিত। বিখ্যাত বিবেকানন্দ- গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু অনুমান করেন ছদ্মনামটি পত্রিকা-সম্পাদক সতীশচন্দ্রেরই। পূর্ব-পরিচয় সূত্রে সতীশচন্দ্র সেখানে (মূল লেখাটি আমরা দেখিনি) যা লিখেছেন তার অংশবিশেষের অনুবাদ শঙ্করীপ্রসাদ করেছেন এইভাবে (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৭১) :

‘‘বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমি নিজস্বভাবে জানি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, পবিত্রতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ শ্রদ্ধা। বহুদিক দিয়ে তিনি সুমহান রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ্য শিষ্য।...

‘‘আমি তাঁকে ভালবাসি, কারণ তিনি সকল মানুষের ভালবাসা পাবার যোগ্য। চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনস্বিতায় পূর্ণ; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু—প্রসন্ন-স্থির প্রেমে ও স্নেহে তোমার প্রতি আনত; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব— সত্যই ভালবাসার যোগ্য মানুষ— এই বিবেকানন্দ! আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার তিনি নির্ধারিত পুরুষ। তাঁর বৃহৎ উদার কোমল হৃদয়, তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর আত্মত্যাগ, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি, তাঁর পবিত্রতা এবং অতি উচ্চমার্গের বুদ্ধিশক্তি— এই সকলের দ্বারা যে-কোনও বহু সহস্রের সমাবেশেও তিনি অনন্য পুরুষ। তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তুমি তাকাও, দেখবে, তাঁর মধ্যে আছে সঙ্কল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ গ্রহণ করলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে। ...এবং যে-আমি আজ তাঁর বিচার করতে বসেছি, সেই আমি হয়তো একদিন তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পেলেও ধন্য বোধ করব।’’

(লেখক ডন সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। স্বামীজীর সহপাঠী।)

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া প্রত্যুষ মণ্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩					
ভ্রমণ	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য		
			প্রাপ্তবয়স্ক	বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর	শিশু ২-৪ বৎসর
উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা)	১২	১৫ই মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ)	১২	২৮শে মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
গ্যাংটক-নামচি-পেলিং	৮	১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩	৭,০০০/-	৫,৫০০/-	২,০০০/-
দার্জিলিং-গ্যাংটক	৮	২৩শে মে,২০১৩	৬,৮০০/-	৫,১০০/-	১,৭০০/-
সিমলা-কুলু-মানালী	১১	৯ই মে,২০১৩	৯,৫০০/-	৭,৩০০/-	২,৪০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং।

প্যাকেজে থাকছে না :- এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং আজকের যুবসমাজ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

স্বামীজী বলতেন : প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপত ঈশ্বর। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে বিকাশ করতে হবে। তিনি সেই বিকাশের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন দেশপ্রেমের বাণী। তাঁর সেই উভয়প্রকার বাণীতে সেদিন ভারতবর্ষের অসংখ্য যুবক উদ্দীপিত হয়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনমুক্ত হয়েছিল। এটি ঐতিহাসিক সত্য। স্বামীজী বলেছিলেন : 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাবে। প্রগতির পথ, সমৃদ্ধির পথ। বাঁচার পথ। সেই পথ কি? স্বামীজী বলেছিলেন, সেই পথ আধ্যাত্মিকতার পথ। সামরিক বা অর্থনৈতিক শক্তিতে নয়— আধ্যাত্মিক শক্তিতে, চরিত্রের শক্তিতে, মনুষ্যত্বের শক্তিতে মানুষকে দাঁড়াতে হবে, পথ চলতে হবে। চলার পথে বাধা থাকবে না, সে কি হয়? বাধা তো থাকবেই। বাধাই যদি না থাকে তাহলে চলার আনন্দ কোথায়? স্বামীজী বলতেন : বাধা থাকুক, ব্যর্থতা থাকুক। সহস্রবার হোঁচট খাও। পড়ে যাও। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াও। পিছনে ফিরে যেও না। পিছনে তাকিও না। তুমি শুধু চল। তোমার দৃষ্টি থাকুক সম্মুখে প্রসারিত। সিদ্ধি? জয়? সে আসবেই একদিন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের যুবসমাজ যেন আত্মবিশ্বাসের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। উদ্দীপ্ত হয় দেশপ্রেমের প্রেরণায়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আর দেশপ্রেম— এই দুটি সম্পদের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হলে, স্বামীজী জানতেন, ভারতবর্ষের যুবসমাজ সমগ্র দেশকে উত্তোলন করতে পারবে। আত্মশক্তি বলতে স্বামীজী বুঝতেন চরিত্রের শক্তি, আর দেশপ্রেম বলতে বুঝতেন দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা।

"আমরা আপনার কাছে এসেছি ধর্মের কথা শুনতে, আমাদের কিছু ধর্মের কথা বলুন।" ১৯০১ সাল। স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় আছেন। তাঁকে কথাগুলি বললেন ঢাকার কয়েকটি তরুণ। হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁর জনকয়েক বন্ধু। হেমচন্দ্র পরবর্তীকালের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক। 'নওজোয়ান'রা এসেছে ধর্মের কথা শুনতে! সন্ন্যাসী তিনি, ধর্মনেতা তিনি, তাঁর খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মোটেই খুশি হলেন না, বরং বিরক্ত হলেন, ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন : "ধর্ম? কাপুরুষের দল! পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই, পরাধীন জাতির শ্রাদ্ধাধিকার পর্যন্ত নেই। বিদেশী লুঠেরার দল তোমাদের দেশমাতৃকার বুকের ওপর বসে তাঁর রক্ত চুষে খাচ্ছে, তোমাদের মাতৃভূমির সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, দেশের মানুষের ওপর নির্বিচারে শোষণ, অত্যাচার আর নিপীড়ন চালাচ্ছে, আর আহাম্মকের দল, তোমরা এখন ধর্মের কথা শুনতে চাও। তোমাদের এখন একমাত্র ধর্ম দেশজননীর শৃঙ্খলমোচন। লজ্জা করে না তোমাদের, গোলামের জাত, এসেছ ধর্মের কথা শুনতে? আগে নিজেদের মধ্যে মানুষের শক্তির জাগরণ ঘটাও, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হও, দেশমাতৃকাকে মুক্ত কর। তারপর এস ধর্মের কথা শুনতে। তার আগে নয়।"

হেমচন্দ্র ঘোষ বলতেন : "স্বামীজীর সেই অগ্নিবাণী আমাদের মগ্নচৈতন্যে আঘাত করে। আমাদের চৈতন্য জাগে। তখনি আমরা অঙ্গীকার করি, দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব। আমাদের দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটান স্বামীজী। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের চোখে একজন তথাকথিত সন্ন্যাসী বা ধর্মনেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি আগ্নেয়গিরি। সেই আগ্নেয়গিরি থেকে কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ এসে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আমার চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।"

কিছুদিন আগেও আমরা সর্বত্র সমাজতন্ত্রের কথা শুনতাম। শুনতাম সাম্যবাদ, কম্যুনিজমের কথা। সারা জগতে সাম্যবাদ কিছুদিন আগেও ছিল একটা 'ক্রেজ'। ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই প্রথম সাম্যবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "আমি একজন সমাজতন্ত্রী, তবে তার কারণ এই নয় যে,

আমি ওই মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মনে করি। কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'— এই হিসাবে ওই মতের আমি সমর্থক।'' সমাজতন্ত্র একটি আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠন করা যাচ্ছে ততক্ষণ 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভয়ানক দারিদ্র্য বা বেকারত্ব নেই, প্রত্যেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, বাসস্থান আছে; প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় পোশাক সেখানে পায়। অর্থাৎ পার্থিব জগতের চাহিদা সমাজতন্ত্রী দেশগুলি অনেকাংশে পূরণ করেছে। স্বামীজী চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সে সুযোগ আসুক। তাদের দারিদ্র্য দূর হোক। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দেশগুলি যেখানে থেকে গেছে, স্বামীজী তার পরেও শুরু করতে চেয়েছিলেন। দেহের চাহিদা মিটলেও মানুষের আরও চাহিদা থেকে যায়। সে-চাহিদা আত্মার চাহিদা। দেহের ক্ষুধার পরে থাকে আত্মার ক্ষুধা। স্বামীজী তাই বলেছিলেন, সমাজবাদ সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়। সমাজবাদের সঙ্গে ধর্মকে আনতে হবে, বেদান্তকে আনতে হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে মেলাতে হবে। জড়ের সঙ্গে চৈতন্যকে।

যে-সমাজে জড়বাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় হবে তখনি সেই সমাজে হবে ব্যক্তি ও সমষ্টির বাঞ্ছিত বিকাশ। স্বামীজী চেয়েছিলেন, সেই সমাজের জন্ম হোক ভারতবর্ষে। অতীতের ভারতবর্ষ দেহ এবং আত্মার, দারিদ্র্যমুক্তি এবং অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের মাটিতে, ভারতের কৃষ্টিতে, ভারতের ঐতিহ্যে সেই সাধনার বীজ বিদ্যমান। প্রয়োজন তার অঙ্কুরোদগমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে গেলে দেশের যুবসমাজকে জানতে হবে দেশের জাতীয় ঐতিহ্যকে, দেশের কৃষ্টিকে। তাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে অতীতের ইতিহাসের প্রতি, দেশের মহাপুরুষদের প্রতি, দেশের ঐতিহ্য এবং দেশের সংস্কৃতির প্রতি।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ পৃথিবীকে একটি নতুন আদর্শের সন্ধান দেবে। ভারতবর্ষ বেদান্তের সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয় ঘটাবে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলন ঘটাবে। আমেরিকার ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে স্মরণ করে শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে বলেছিলেন : ''পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দের সফল অভিযানের ফলে বিশ্বমানসে প্রথম উপলব্ধি ঘটল যে, ভারতবর্ষ জাগ্রত হয়েছে— শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীকে জয় করার জন্যও।'' কোন্ শক্তি দিয়ে জয় করবে পৃথিবীকে? চরিত্রের শক্তি দিয়ে। ধর্মের শক্তি দিয়ে। আধ্যাত্মিকতার শক্তি দিয়ে। স্বামীজী স্বয়ং সেই জয়ের পথ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

স্বামীজী তাঁর পার্থিব শরীর ছেড়ে চলে গেছেন ১৯০২ সালে। কিন্তু আজও কেন তাঁর কথা বলছি, কেন তাঁর কথা ভাবছি? কারণ ব্যক্তি বিবেকানন্দ চলে গেলেও বিবেকানন্দের আদর্শ পৃথিবীতে আজও রয়েছে। আদর্শ-বিবেকানন্দ আজও জীবিত, চিরজীবিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ নামক আগ্নেয়গিরি থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁদের হৃদয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তাঁদের নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেছিল। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের ঘটনাতেও সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত। স্বামীজীর পার্থিব শরীরের অবসানে হতাশাকাতর নিবেদিতার মন। যাঁকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তিনি চলে গেলেন। স্বামীজীর প্রজ্বলিত চিতাশয্যার অদূরে শোকস্তব্ধ, ভগ্নহৃদয় নিবেদিতা হঠাৎ অনুভব করলেন, স্বামীজী যেন বলছেন--- ব্যক্তি-বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আদর্শ-বিবেকানন্দ মরেননি। তিনি মরতে পারেন না। কারণ, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত দেখতে চান। ভারতবর্ষের যুবসমাজ, তরুণ সমাজ, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে রূপায়িত করবে। তিনি অপেক্ষা করে আছেন সেই ভারতবর্ষের জন্য।

স্বামীজীর স্বপ্নের সেই ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার জন্য আজকের তরুণ ও যুবকদের জন্য, তরুণী ও যুবতীদের জন্য তাঁর বার্তা বহন করে চলেছে তাঁর 'বাণী ও রচনা', তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি। তাদের সকলের মধ্যে তাঁর আদর্শ, তাঁর শক্তি কাজ করবে, আমরা বিশ্বাস করি। স্বামীজীর লেখা যে পড়বে তার মধ্যেই তাঁর শক্তি আসবে এবং সেই শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে, স্বামীজী স্বয়ং একথা বলেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারত একদিন স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতে রূপায়িত হবে। স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন, ভারত একদিন উঠবে। অপ্রতিহত গতিতে উঠবে। পৃথিবীর কোন শক্তির সাধ্য নেই ভারতের উত্থানের প্রতিরোধ করে। ভারত উঠবে তার চৈতন্যের শক্তিতেই, কিন্তু জড়ের শক্তিকে অগ্রাহ্য করে নয়, অস্বীকার করে নয়। জড়কে গ্রহণ করে, জড়কে চৈতন্যের রসে জারিত করে, ভোগবাদী জীবনদর্শনে ত্যাগবাদী আদর্শকে সমন্বিত করে, দেহ ও আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তিসাধন করে এক নতুন সমাজদর্শনের সন্ধান দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সমাজদর্শনে আদি, মধ্য ও অন্ত জুড়ে থাকবে ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রাণরস, ভারতের সনাতন জীবনদর্শনের প্রাণপ্রবাহ, অথচ তা উন্মুক্ত থাকবে পাশ্চাত্যের কর্মসংস্কৃতি, বীর্যবত্তা, বিজ্ঞান- প্রযুক্তি এবং সুস্থ জীবনমুখী আদর্শকে স্বীকার করার জন্য। দেওয়ার এবং নেওয়ার, মিলবার এবং মেলাবার এই দর্শন ভারতের নিজস্ব দর্শন। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, চিন্তা এবং সাধনা সেই প্রবাহপথেই অগ্রসর হয়ে এসেছে। যখনই সঙ্কীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার আবর্তে সেই চিরায়ত প্রবাহ বদ্ধ হয়েছে তখনই ভারতবর্ষে নেমে এসেছে প্রগতির অন্ধকার, সংস্কৃতির সঙ্কট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আর্ষ দৃষ্টিতে ভারতের সেই সীমাবদ্ধতাকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং পথনির্দেশ দিয়েছিলেন নতুন উত্থানকে কার্যকরী করার এবং সেই আগামী মহা-উত্থান সম্ভবায়িত করবে ভারতের যুবসমাজ।

প্রসঙ্গত স্মরণ করি স্বামীজীর সেই মহাবাণী, যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক কলকাতা-অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত অভিভাষণে : ''বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।... কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিবে। যে-মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মূল কারণ। ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে মুহূর্তমধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।'' আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বীর সন্ন্যাসীর সেই বজ্রনাদ।

জাতীয় পুনর্গঠন : স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ

কে. সূর্যনারায়ণ রাও

স্বামী বিবেকান্দের আবির্ভাবের তাৎপর্য

বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকান্দের পরিচয় দেওয়া অর্থহীন। সনাতনধর্ম এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব কোনও সামান্য ঘটনা নয়। দৃপ্ত যৌবনের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে গড়ে তুলেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অবতার। যিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য এবং তাঁর চিন্তা ও বাণীর দ্বারা হিন্দু সমাজকে জাগিয়ে তোলবার জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এই সুপ্রাচীন জাতিকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তার সাযুজ্য রক্ষা করেছে এবং সর্বত্র সহস্র সহস্র মানুষের জীবনে প্রকৃত দিশা দেখিয়েছে। হিন্দু সমাজে বিবেকানন্দ বহু বিচিত্র পথে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নামে দেশের অসংখ্য গ্রামগঞ্জে, প্রতিটি শহর ও শহরতলিতে অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান ও সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে ও উঠছেও। স্বামী বিবেকানন্দ যে গোটা হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, সে কথা আজ এক ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর বাণীর তড়িৎপ্রবাহ বিদেশী মনীষী রোঁমা রোলাঁও অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, বিবেকানন্দের বাণী শুধুমাত্র কতকগুলি শব্দের সমষ্টি নয়, তাঁর বাণীর মধ্যে নিহিত আছে শাশ্বত জীবনের বীজ। তিনি লিখেছেন : তাঁর (বিবেকানন্দের) এইসব কথা ছড়িয়ে আছে ত্রিশ বৎসর আগে লেখা বইগুলির মধ্যে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখনই আমি লেখাগুলি পড়ি আমার সমস্ত শরীর দিয়ে যেন চকিতে তড়িৎ স্পর্শের মতো শিহরণ বয়ে যায়।" তাই রোঁমা রোলাঁ প্রশ্ন করেন : 'তা হলে তাঁর কথাগুলি যে সময় এই বীরের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই সময় সেগুলি কী শিহরণ, কী উন্মাদনাই না সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।"

স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিশালী চিন্তা ও বাণী যে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, এমন নয়। সমকালীন বিশ্ববিশ্রুত মনীষীদেরও স্বামী বিবেকানন্দের সুগভীর চিন্তা ও তেজোপূর্ণ বাণী বিমোহিত করেছিল। এখানে এমনই একজন মনীষীর কথা বলা হচ্ছে যাঁর একক প্রচেষ্টাতে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে আমেরিকার শিকাগোতে বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার পথ সুগম হয়েছিল। ডঃ জন হেনরী রাইট ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদী গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণদানের লক্ষ্যে নিমিত্তের কাজ করেছিলেন। নানা বিষয়েই সুপণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অধ্যাপক রাইটের অনেক আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাসূত্রেই অধ্যাপক রাইট প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগাদানের খুঁটিনাটি নিয়ম জানা না থাকায় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় উপস্থিত হয়েও ঐ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পাবার আশা পরিত্যাগ করেছেন। ধর্মসম্মেলনে তাঁর যোগ দিতে না পারার অর্থ হলো, বিশ্বধর্মসম্মেলনে সনাতন হিন্দু ধর্মের কোনও প্রতিনিধির অনুপস্থিতি। স্বামীজীর হতাশার কথা জানবার পরে তাঁর গুণমুগ্ধ রাইট বিশ্বধর্মসম্মেলনে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে বারংবার জোর দিতে লাগলেন। রাইট তাঁকে বললেন— 'বিশ্বের দরবারে আপনার পরিচিত হবার এই একমাত্র পথ। আপনার চিন্তাভাবনা চার দেওয়ালের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকার কথা নয়।' স্বামীজী যখন সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে তাঁর সমস্যার কথা খুলে বললেন এবং জানালেন যে, সম্মেলনে যোগ দেবার বৈধ আমন্ত্রণপত্রও তাঁর কাছে নেই, তখন রাইট শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়ার অর্থ সূর্যকে জিজ্ঞাসা করা জগতকে তার কিরণ দেবার অধিকার আছে কিনা।' এ কথা বলে বিশ্বধর্মসম্মেলনের কর্মসমিতির সভাপতিকে (ডঃ ব্যারোজ) তিনি একটি পত্রে লিখলেন আমেরিকার সমস্ত প্রাজ্ঞ অধ্যাপককে সম্মিলিত করলে যা হবে, এই সন্ন্যাসী তার চেয়েও বেশি পণ্ডিত।' আসন্ন সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁর পরিচিত আরও কয়েকজনকে রাইট অনুরূপ পত্র দিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই রাইটের যদি এমন মনোভাব হতে পারে, তবে বলা বাহুল্য পরবর্তী ঘটনাবলী এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছিল।

বিশ্বধর্মসম্মেলনে কিম্বা আমেরিকা ও অন্যত্র স্বামীজীর অসামান্য খ্যাতি সত্ত্বেও তার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসা তিলমাত্র ক্ষীণ হলো না। বরং তাঁর দেশপ্রেম আরও বেশি আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত হয়ে উঠল। ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করবার প্রাক্কালে জনৈক ইংরেজ বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজী, বিলাসপূর্ণ, ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান পাশ্চাত্যদেশে চার বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে এখন আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?' এ কথার উত্তরে স্বামীজী বললেন, 'দেশ ছেড়ে আসবার আগে আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম; এখন ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতবর্ষের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র, ভারতবর্ষ এখন পুণ্যভূমি-তীর্থক্ষেত্র।' এমনই ছিল মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেম। তাছাড়া ভারতবর্ষের জনগণের সম্বন্ধে ছিল তাঁর নিদারুণ উদ্বেগ। ভারতবর্ষে পৌঁছাবার পরে দক্ষিণে ভারতবর্ষের জনগণ সম্বন্ধে তাঁর এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। এ পর্যায়ে স্বামীজীর ভাষণগুলি 'Lecturs from Colombo to Almora' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ অনতিবিলম্বেই ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর তেজোময় চিন্তা আর

শক্তিশালী বাণী জাতীয় আন্দোলনের সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতা ও সংগ্রামীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। সে-সময়ে স্বামীজীর 'Lecturs from Colombo to Almora'— গ্রন্থটি সমস্ত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর চিন্তা ও বাণী জাতীয় আন্দোলনের ছোট-বড় সমস্ত নেতাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। কিভাবে তাঁরা স্বামীজীকে দেখেছিলেন এবং তাঁর বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার কিছু নমুনা এবার এখানে তুলে ধরা হলো :

মাহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন : স্বামী বিবেকান্দের রচনাবলী আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি এবং সে সমস্ত পাঠ করবার পরে মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালবাসা সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছে।'

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'যদি তুমি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, বিবেকানন্দ পড়ো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই সদর্থক, নেতিবাচক কিছু নেই...।' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বললেন : স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসাবে সম্মানিত হবার যোগ্য। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত একজন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং মনে-প্রাণে একজন সংগ্রামী। তাই তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। সেজন্যই তিনি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উপনিষদ বারংবার বলছে— 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'— চাই শক্তি, চাই বল। স্বামীজী চরিত্র গঠনের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, আমি তাঁকে গুরুপদে বরণ করতাম...।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর চিন্তার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিতজী লিখেছেন : ''বস্তুতঃ, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন যার ফলে আমাদের অতীত সম্পদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একপ্রকার গর্বের মনোভাবই সৃষ্টি হয়েছে।" হতাশ এবং আদর্শভ্রষ্ট হিন্দুমানসে তিনি শক্তির সঞ্চার করেছিলেন, তাকে দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস এবং অতীত সম্পদের উত্তরাধিকার। প্রচলিত অর্থে রাজনীতিবিদ্ বলতে যাকে বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্যই তা ছিলেন না। তথাপি তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের একজন স্রষ্টা। পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় আন্দোলনে কমবেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আজকের ভারতবর্ষকে তিনি প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছেন। প্রজ্ঞা, তেজ এবং শক্তির যে প্রবাহ স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে, আমি মনে করি, আজকের তরুণসম্প্রদায় তার সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে।

সি. রাজাগোপালাচারী ছিলেন একজন মৌলিক চিন্তাবিদ যাঁর সঙ্গে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর মতপার্থক্য হয়েছিল। এছাড়াও তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল। স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন : স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম এবং ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি না থাকলে আমরা আমাদের ধর্মকে হারাতাম, স্বাধীনতাও অর্জন করতে পারতাম না! তাই আমাদের সমস্ত কিছুর জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা ঋণী। তাঁর বিশ্বাস, সাহস এবং প্রজ্ঞা আমাদের চিরদিন অনুপ্রাণিত করুক, যাতে তাঁর থেকে আমরা যে সম্পদ লাভ করেছি, তাকে আমরা সযত্নে রক্ষা করতে পারি।

জাতীয়তাবাদী মিস্টিক কবি সুব্রহ্মণ্যম ভারতী বলেছেন— হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য বিবেকানন্দই পুরোধা পুরুষ।

মোরারজি দেশাই মন্তব্য করেছেন— সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অনুপ্রেরিত করেছেন যাতে ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারে।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ কীভাবে স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন, উপরে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উৎসাহদাতাই ছিলেন না, তিনি ভারতবর্ষের মুক্তিকেও ত্বরান্বিত করেছিলেন।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য বিবেকানন্দের আন্তরিক প্রয়াস

যখন সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন, তখন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক স্বামী বিবেকানন্দ নিজে কি বৃটিশের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন? স্বামীজীর ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন যে, স্বামীজী একদা তাঁর বিদেশী ভক্তদের বলেছিলেন তিনি দেশীয় রাজাদের ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করবার জন্য অনুপ্রেরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তেমন সাড়া মেলেনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীজীকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, দেশটা মরে গেছে। অতঃপর তিনি সংকল্প করলেন, একেবারে নীচু স্তর থেকেই ভারতবর্ষীয় জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে বৃহত্তর মুক্তি আন্দোলনের জন্য।

মানুষ তৈরি ও চরিত্র গঠন : বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে

বিবেকানন্দের পরম ভক্ত ও শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা 'The Master as I saw him' গ্রন্থে লিখেছেন যে, স্বামীজী স্বয়ং প্রায়ই বলতেন যে, হিন্দুধর্মের জাগরণ এবং ভারতবর্ষকে তার অতীত গৌরবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। বারবার তিনি দেশকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। যুবসম্প্রদায়ের কাছে তিনি আবেদন রেখেছেন দুর্বল, অসহায় মানুষের ব্যথা অনুভব করে তাদের উন্নতির জন্য কাজে অগ্রসর হবার। তিনি বলতেন, ত্যাগ এবং সেবা হলো আমাদের দেশের যুগল আদর্শ। মানুষ গড়ে তোলা, চরিত্রগঠন, শৃঙ্খলা এবং সংগঠন-এ চারটিকেই স্বামীজী যুগ-প্রয়োজন বলে নির্দেশ করতেন। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নিষ্ঠাবান কর্মীদের দল। জাতির প্রতি এই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান। তিনি বলেছেন : আমি নিজেকে হিন্দু বলবার জন্য গর্বিত। ভগবদ্‌কৃপায়, আমার স্বদেশবাসীগণ, তোমরাও সেই গর্ব মর্মে মর্মে অনুভব করো। তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যে তোমাদের বিশ্বাস রক্তের প্রতিটি কণাতে ঝংকার তুলুক। এই বিশ্বাস তোমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হোক, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য এই বিশ্বাসে নির্ভর করে তোমরা কাজ করো।

স্বামীজীর দর্শনই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যদবাণীই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ। হিন্দু পুনর্জাগরণে স্বামীজীর স্বপ্নই

বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের হৃদয় ও মনকে অধিকার করেছিল স্বামী বিবেকানন্দেরই চিন্তাসমূহ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকবার সূত্রে মানবচরিত্রের দীনতা দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কোথায় সেই চরিত্র, সেই অধ্যবসায়, সেই স্বদেশানুরাগ! সকলেই ঘোরতর স্বার্থান্বেষী এবং সেজন্য সঙ্ঘ গড়ে তুলতে কেউই প্রস্তুত নয়। গভীর ভাবনাচিন্তার পরে তিনি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে চাইলেন, যার মধ্য দিয়ে দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শৃঙ্খলাপরায়ণতা, চরিত্র এবং খাঁটি স্বদেশানুরাগের সৃষ্টি হবে। এই যুবকেরা হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যে একতা এবং সচেতনতা আনয়ন করবে এবং সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে গর্ববোধ যাতে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্গঠিত হয়। বিস্ময়ের কথা হলো, স্বামীজী এবং ডাঃ হেডগেওয়ার দু'জনে একই ভাবে জনজাগরণের কথা চিন্তা করেছিলেন, দু'জনেই চিন্তা করেছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ, চরিত্রবান, স্বদেশপ্রেমী জনগণের শক্তিশালী সংগঠনের কথা, বিশেষতঃ যখন তাঁরা দুজনেই রাজনৈতিক কর্মপন্থা সম্বন্ধে আস্থা হারালেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যোগ

১৯২৫ খৃস্টাব্দের বিজয়া দশমীর পুণ্যতিথিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সূচনা। ১৯৪০-এর ২১ জুন পরলোকে যাত্রা করবার আগেই ওই বৎসরের জুন মাসে ডাঃ হেডগেওয়ার শ্রীগুরুজী গোলওয়ারকর -এর হাতে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তারপর থেকে দীর্ঘ ৩৩ বৎসর যাবৎ শ্রীগুরুজী নিরলসভাবে সঙ্ঘের দায়িত্ব পালন করে যান এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন ডাঃ হেডগেওয়ার প্রতিষ্ঠিত সংঘের আদর্শে। শ্রীগুরুজী থাকতেন রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী অখণ্ডানন্দের আধ্যাত্মিক আশ্রয়ে। অখণ্ডানন্দজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রিয় গুরুভ্রাতা। স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহাবসানের পরে শ্রীগুরুজী নাগপুরে ফিরে আসেন এবং ডাঃ হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। সে সময়ে কোনও একটি সংবাদপত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিছুকাল আশ্রম জীবন যাপন করবার পরে তিনি কিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভিন্নধর্মী কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। উত্তরে শ্রীগুরুজী তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : আমি অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, সঙ্ঘে আমি যে কাজ করছি, সে কাজ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মদর্শন ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর কোনও মহাপুরুষের জীবন ও বাণীই আমাকে এভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস, সঙ্ঘের কাজ করবার সূত্রে আমি স্বামীজীর কাজই করছি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত আরেকজন প্রবীণ সন্ন্যাসী, তামিলনাড়ুর স্বামী চিদ্ভবানন্দও একইরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তান ও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দের শিষ্য। প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যাপারে তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে সঙ্ঘের প্রত্যেকটি কাজ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি স্বয়ংসেবকদের সভাতে বললেন : হে যুবকবৃন্দ। আপনারা কৃতার্থ যে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত মানুষ-গড়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেই আপনারা অনুশীলিত হচ্ছেন। আমি বুঝতে পারছি, এবং নিঃসংশয় হয়েছি যে, এ স্বামীজীর কাজ, ঈশ্বরের কাজ। হিন্দুজাতির পুনর্গঠন শ্রীরামকৃষ্ণের দু'জন সাক্ষাৎ শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাদ্বয়ের কৃপাধন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দুই যুগন্ধর আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা ডাঃ হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের উপলব্ধি থেকেই নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে। হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সনাতন ধর্মের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের যে পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন, তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মধারা যে সংগতিপূর্ণই হয়েছে, সে সম্পর্কে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে? ডাঃ হেডগেওয়ার এবং শ্রীগুরুজী দু'জনেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন এবং সর্বতোভাবে সঙ্ঘের কাজ করতেন।

জাতীয় পুনর্জাগরণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যবহারিক সূত্র :

স্বামী বিবেকানন্দ দুঃখের সঙ্গে বলতেন যে, দেশের অনেক বুদ্ধিমান মানুষ অতি উচ্চ আদর্শের কথা বলে কিন্তু কার্যে পরিণত করতে পারে না। চাণক্য কৌটিল্যও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে, আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিমান ও সৎ মানুষের নিষ্ক্রিয়তা কতিপয় মন্দ মানুষ ও শত্রুর মারাত্মক কর্মকাণ্ডের থেকেও দেশের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়েছে। এই নিষ্ক্রিয়তাই দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না কীভাবে এই সৎ এবং বিশিষ্ট লোকেদের সামিল করিয়ে জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করা যাবে। ডাঃ হেডগেওয়ারের তপস্যাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন্ত ধ্যানধারণাকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দেশ জুড়ে সমাজের ধীমান এবং সৎ মানুষদের সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। এই সঙ্ঘের সদস্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বিস্মৃত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশমাতৃকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও হিন্দুরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য সমগ্র শক্তি দিয়ে কাজ করছেন এবং তারই মাধ্যমে তাঁরা হয়ে উঠছেন স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরসূরী।

স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ হেডগেওয়ার এবং গুরুজীর সমধর্মিতা

বর্তমান প্রবন্ধটির (সঙ্কলনের) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের মানুষগড়া ও চরিত্র গঠনের আদর্শের সঙ্গে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার এবং শ্রীগুরুজীর আদর্শের একমুখিতা প্রদর্শন করা। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ছিলেন, গুরুজীও তেমনি ডাঃ হেডগেওয়ারের কাছে ছিলেন। এঁদের স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা কীভাবে শেষ পর্যন্ত একই বিন্দুতে এসে মিলিত হলো, বর্তমান সঙ্কলনে তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, গুরুজী যেন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ডাঃ হেডগেওয়ারের সম্বন্ধের স্থাপয়িতা।

(লেখক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আর এস এসের প্রাক্তন অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ। অনুবাদক : জয় ভট্টাচার্য্য)

এই সময়ের ভারত এবং বিবেকানন্দ

দেবীপ্রসাদ রায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষে যে নৈতিক এবং আত্মিক সংকটের আবর্তে পড়েছে সমগ্র জাতি এই মুহূর্তে তার প্রেক্ষিতে সেই সংকট নিরসনে স্বামীজীর পথনির্দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করা এবং বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ১৮৬৩ সাল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধান বর্ষ ১৮৮৬ —এই কাল ছিল সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের বিবিদিশানন্দ হওয়ার প্রস্তুতির কাল। ডিরোজিও-সৃষ্ট ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের শেষের দিকের প্রতিভূ হিসেবে নরেন্দ্রনাথের জীবন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের আপাত রহস্যময় এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ এবং অনুধাবনের শেষে শিক্ষিত তর্কপ্রবণ নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন আধ্যাত্মিক বৈভবে পূর্ণ এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে সাধারণ সন্ন্যাসী কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত মুক্তির চিন্তার সংকীর্ণ জগৎ থেকে বৃহত্তর মানবমুক্তির প্রয়াসের জগতে উত্তরণ ঘটেছে তাঁর। গুরুভাইদের জন্য একটা আস্তানার ব্যবস্থা করেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজক হিসেবে দেশের মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন কি বুঝতে সন্ন্যাসীরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষান্তে তাঁর কি, কারোরই কোনও সন্ন্যাসী-সুলভ নাম দেননি। নিজের পরিচয় গোপন করতে তিনি নাম গ্রহণ করলেন বিবিদিশানন্দ, ধূলিধূসরিত পথ প্রান্তর বনাঞ্চল দুর্গমগিরি কান্তারের মধ্যে দিয়ে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করতে। অন্নবস্ত্রবাসস্থান বিষয়ক সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা নিয়ে এই দুঃসাহসিক এবং সহায়সম্বলহীন দেশপরিক্রমাই তাঁর মধ্যে মানবতাবাদী এক দর্শনের উদ্ভব ঘটাল। তিনি

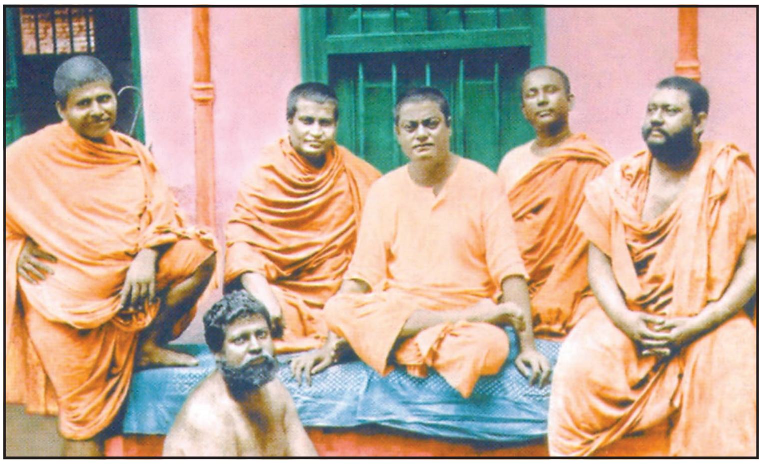

গুরুভাইদের সঙ্গে স্বামীজী।

কাটিয়েছেন দীনতম দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে, সামাজিক ভাবে অচ্ছুতদের মধ্যে, কখনও বা গুণমুগ্ধ রাজা-রাজড়াদের মধ্যে। অহংবোধের যে অবশিষ্টাংশ নিয়ে এই যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন তা একে একে বিদূরিত হলো নানাজনের কাছে শিক্ষা নিয়ে। খেতড়ীর রাজার অনুরোধে তাঁর এক নর্তকীর গান শুনতে অনেক আপত্তির পর রাজী হলেন। সেই নর্তকীর গান "প্রভুজী মেরে অবগুন চিতে না ধর— সমদরদী হ্যায় নাম তুমহার..." শোনার পর তার মর্মার্থ বুঝে এক অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তিনি— সন্ন্যাসীর সমদরদী হওয়াই তো দরকার। চরম দারিদ্র্য, সামাজিক অবহেলা নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের মধ্যে নৈতিকতার দীপ্যমান শিখা লক্ষ্য করে তিনি অবাক হলেন। পরে তিনি বলেছিলেন এদের উদ্দেশ্যেই... "এক মুঠো ছাতু খেয়ে এরা জগৎ উল্টে দিতে পারে।" তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধান এই এদের মধ্যেই শেষ হলো— "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" এদের উত্থানই ভারতের উত্থান এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। এদের সম্পর্কে তিনি ভাবতে বলেছিলেন দেশবাসীকে... মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী— নীচ জাতি, মুচি মেথর... আমার ভাই... বলেছিলেন— মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এইসব মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে দু'মুঠো ভাতের যোগাড় করতে কী করা যায় এই তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে চোখের জলও তিনি ফেলতেন। এই সময় আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বধর্ম মহাসভার কথা এদেশে পৌচেছে। তাঁর অনেক শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছে তিনি যেন আমেরিকা— তিনিও বিদেশে সৃষ্ট ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে বিকৃত ধারণার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত ভারতকে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করছিলেন, কন্যাকুমারীতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি তখন দেখলেন সমুদ্রের মধ্যে রামকৃষ্ণেরই অবয়ব— তিনি এটিকে একটি অর্থবহ ইঙ্গিত মনে করলেন— শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং আমেরিকা যাওয়া মনস্থ করলেন। অভাবিতভাবে এই যাত্রার উদ্যোগপর্ব শেষ হলো। খেতড়ীর

মহারাজার দেওয়া 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করে, এবং নানাদিকের চরমতম অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ও শ্রীমার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি নামলেন যে দুঃসাহসিক ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশ যাত্রায়, রোমা রঁলা তাকে বলেছেন— "This journey was indeed an astonishing adventure." ৩১ মে ১৮৯৩-এ শুরু হওয়া যাত্রা শেষ হলো জুলাই-এর মাঝামাঝি চিকাগো শহরে গিয়ে। তারপর তাঁর শেষ অবধি ধর্মসমহাসভায় বক্তৃতা দেওয়া এবং 'Cyclonic Hindu Monk of India' হিসেবে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য জয় চমৎকারিত্বে এবং বিস্ময়ে বিশ্বে একক অতুলনীয় ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। গোটা ভারতীয় সমাজ বিপুলভাবে নাড়া খেল। দুঃসাহসিক অভিযান— কঠিনতম কাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য বিবেকানন্দ এক চিরকালীন উদাহরণ হয়ে গেলেন। দেশে ফিরে তিনি দেশের প্রতি আহ্বান জানালেন 'আগামী ৫০ বছরে দেশমাতাই একমাত্র আরাধ্য দেবতা'। দলে দলে ছাত্র যুব সাধারণ মানুষ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড়, শিল্পী এই আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হলো। ১৯০৫-এ ভারতে প্রথম জাতীয়তাবোধে সম্পৃক্ত গণআন্দোলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দৃশ্যমান হলো, ১৯১১ সালে দেশের খেলোয়াড়রা ফুটবলে শাসক ইংরাজ দলকে হারিয়ে জিতে নিল আই এফ এ শীল্ড। দেশবাসী দেখতে থাকল রাসবিহারী বসুর দুঃসাহসিক জাপান যাত্রা এবং সর্বশেষ নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণ এবং ৫০ বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা অর্জন।

ভুবনেশ্বরী দেবী

মা সারদা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বামীজীর কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞান প্রযুক্তি অনুশীলনে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছে আমাদের দেশ। অনেকক্ষেত্রেই বিশ্ব-স্বীকৃতি আদায় করেছে আমাদের বিজ্ঞানীরা। তবুও সার্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যর্থতা, সম্পদ বন্টনে পীড়াদায়ক অসাম্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উত্তরোত্তর অশান্তি স্বামীজীর স্বপ্ন পূরণে আমাদের ব্যর্থতাই প্রকট করছে। পাশ্চাত্য ভোগবাদী উন্নয়নের ও দর্শনের চাপে ভারতে, শুধু ভারতে নয় তৃতীয়বিশ্বের অন্যান্য দেশেও পারস্পরিক জীবন ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েই চলেছে, হিংসা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ধ্বংসাত্মক মানসিকতা, অতৃপ্তি স্বার্থপরতা কন্টকিত করেই চলেছে জীবনচর্যাকে। ভোগবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে মানুষ হওয়ার পরিবর্তে একান্তভাবে অর্থনৈতিক 'জন্তু'তে পরিণত হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। কিন্তু কেন এমন হলো? যে প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের ছিল বা আছে, যে মানবসম্পদ আমাদের আছে পরাধীনতা মুক্ত ভারত কি তার যথাযথ ব্যবহারে স্বামীজী কাঙ্ক্ষিত মানবতাবাদ সম্প্রসারিত করবে পারত না? মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিলেন স্বামীজী। মানুষের প্রতি প্রেম এবং বিশ্বাস সেবার আদর্শকে ভিত্তি করেই স্বামীজী 'মানবতাবাদের পূজারী, হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, অনেককে বিশ্বাস করানো হয়েছে মানবতাবাদী আন্দোলন এসেছে পাশ্চাত্যদেশ থেকে। এই পাশ্চাত্য মানবতাবাদ প্রথমে প্রাচীন গ্রীক ও রোম মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তা আঞ্চলিকতাবাদ দ্বারা সীমায়িত থাকায় সমগ্র মানবসমাজের জন্য প্রযোজ্য মানবতাবাদে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এরপর এল খৃস্টীয়-মানবতাবাদ যা সংকীর্ণ ধর্মতত্ত্বের (খৃস্টীয়) ভিত্তির উপরই নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রকৃত যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানীদের নিঃসন্দেহ— সার্বিক স্বীকৃতি পায়নি। জার্মানিতে খৃস্টীয় প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে টানা ত্রিশ বছরের যুদ্ধে ভয়াবহ সংখ্যায় লোকক্ষয় দূরস্থ স্বর্গরাজ্যের ঈশ্বর ভজনা-কেন্দ্রিক জীবনচর্যা গভীর বিতর্কের মধ্যে পড়ে। তখনই ঈশ্বর— তথা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের উপর নির্ভরতা নিয়ে উদ্ভব হলো এক নতুন মানবতাবাদ। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি 'A Historian's Approach to Religion'-এ মন্তব্য করেছেন (ভাষান্তরে) "সপ্তদশ শতকের শেষ যুগে পশ্চিমী মানুষের চোখে স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার চেষ্টার চাইতে পার্থিব স্বর্গের সৃষ্টি করার চেষ্টা বেশি বাস্তবমুখী উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়।" তাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা ভোগ্য বস্তুর লভ্যতা ও সেই সঙ্গে সমৃদ্ধি আনার উদ্যোগের উপরই বিশ্বাস স্থাপন, পাশ্চাত্য মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটাল, কিন্তু দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ভয়াবহ পরিণতি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ মানুষের উপর বিশ্বাস ও আনুগত্যকে বিলীন করে দিয়েছে। ধর্মীয় পারলৌকিক কিংবা মানবিক ও ইহলৌকিক কিংবা নৈতিক— সমস্ত মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিল। এর ফলে মানুষের মনে এই পৃথিবীতে তার স্বল্পকালীন শারীরিক অবস্থানের সময় দক্ষ কারিগরি বিদ্যার বলে তার দৈহিক ক্ষুধা যথাসম্ভব মিটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা জন্মলাভ করেছে। মার্কসবাদ এক আশার আলো দেখালেও মানুষকে আকৃষ্ট করলেও পরিশেষে মার্কসবাদী রাজ্যগুলির দানবিক চেহারা দেখে আজ মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত হতাশ এবং বেপরোয়া ভাবে ভোগবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই পরিণাম দেখিয়ে দিয়েছে যে বুদ্ধির সাহায্যে ভৌতপ্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণ-জাত জড়বাদ থেকে মানুষের জন্য প্রকৃত মানবতাবাদ টেনে বের করা যায় না। প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চেতনায় সুদূর ধূসর অতীত থেকে সাম্প্রদায়িক বর্তমান অবধি সাধারণভাবে প্রভাবিত ভারতেও আজ এই অস্থিরতা, বিভ্রান্তি এবং তজ্জনিত সামাজিক সংকট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। পরানুকরণ পরানুবাদ-এর বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের আহ্বানকে তুচ্ছ করে রাষ্ট্রশক্তি ও পাশ্চাত্য ভোগবাদকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করায় ভারতীয় জীবনচর্যাও ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে বিবেকানন্দের মানবতাবাদের অনুসরণ

শুধু আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী মানুষের হতাশা ও বিভ্রান্তি দূর করতে পারে, কৃত্রিম ভাবে সংগঠিত মানবাধিকার সংস্থা তা করতেই পারে না— পারছে না। শুধু বুদ্ধিজাত নয়, হৃদয়মথিত মানবতাবাদই কাম্য যার জন্য নির্দেশিত হয়েছিলেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা বিবেকানন্দ এবং যা বিবেকানন্দ অর্জন করেছিলেন পরিব্রাজক হিসেবে অগণিত মানুষের সান্নিধ্যে এসে। আমরা জানতে পারছি বিবেকানন্দের এক গুরুভাই সারদানন্দের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যখন নরেন্দ্র মানুষের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে গভীরভাবে সংস্পর্শে আসবে তখন তার শক্তির অহংকার দ্রবীভূত হয়ে মানবিক সমবেদনার শক্তিতে পরিণত হবে। জড়বাদসঞ্জাত মানবতাবাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর হৃদয়সঞ্জাত মানবতাবাদের পার্থক্যটা বুঝতে হবে। জড়বাদ মানুষের অন্তর্লোক অনুসন্ধান করেনি। আধুনিক জড়বাদ তা ইউরোপ-আমেরিকান বা মার্কসীয় যাই-ই হোক না কেন তা কেবল পশ্চিমের কঠোর যুক্তিবিরোধী এবং অবৈজ্ঞানিক ধর্মতত্ত্বগুলোর বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত বিবদমান গীর্জা সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া মাত্র। বিজ্ঞান, গণিত, যুক্তিবাদের চর্চা আমাদের দেশে কম ছিল না কিন্তু এরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়নি কেন? কারণ জড়বাদকে তুচ্ছ করা হয়নি তার সঙ্গে ধর্ম তথা অধ্যাত্মচর্চা, মানুষের মনের গভীরে উপলব্ধির চর্চা— এগুলি ছিল। আমাদের জ্ঞানচর্চার ধারণা কীরকম তা ঈশোপনিষদ বলে দিয়েছে— 'অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্ব বিদ্যায়ামৃতমন্মুতে' —জড়বিদ্যা তথা অবিদ্যার সঙ্গে অমৃতত্ব লাভের বিদ্যার চর্চা। সুদূর অতীতে ভারতে জড়বিদ্যার চর্চা থাকলেও অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চাই ছিল প্রধান। সাম্প্রতিক অতীত অবধি তারই জন্য অবহেলিত হয়েছে জড়বিদ্যার চর্চা। প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে সহজ ও উন্নত করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলাম আমরা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুপ্রবেশে আবার জড়বিজ্ঞান চর্চায় প্রবৃত্ত হয়ে অধ্যাত্মচর্চাতে বিস্মৃত হয়েছি। এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বিবেকানন্দ জড়বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছিলেন অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চাকেও। কারণ এই দুইয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানই মানবতাবাদী সমাজ গঠনের প্রধান শর্ত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভোগবাদী জড়বিজ্ঞান চর্চায় মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া এবং অধ্যাত্মচর্চায় উদাসীন থাকার জন্যই আমাদের সমাজ দ্রুত এক অর্থনৈতিক জন্তুর সমাজ গঠনের দিকে ধাবিত হচ্ছে— রাষ্ট্রশাসননীতিও পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে এই জান্তব সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয়েছে। আমরা ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করার পরিবর্তে প্রাণপণে দিক বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে 'অনৈতিক জন্তু'-তে পরিণত করায় সর্বস্ব পণ করেছি সাধ্যাতীত ভাবেই। এই সমাজের ছেলেমেয়েদের সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকছে না। পিতামাতা আত্মীয় পরিজনদের জন্য কাঙ্ক্ষিত চিন্তা ও দায়িত্ববোধ থাকছে না। আরও চাই আরও চাই-এর রাস্তায় প্রযুক্তি বুদ্ধিতে প্রকৃতিকে নিংড়ে নেওয়ার জন্য গোটা মানবসমাজ আজ অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন বুঝেও আমরা থামতে পারছি না। ঠিক এই মুহূর্তেই আমরা 'বিবেকানন্দে'র দিক্‌দর্শনকে চাই। বৈদান্তিক আদর্শকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসার পন্থাপদ্ধতি বিবেকানন্দ দিয়েছেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে যিনি বৈদান্তিক সত্যগুলিকে লালশালুতে মোড়া পুঁথির থেকে মুক্ত করে সহজ সরল হৃদয়স্পর্শী ভাষায় সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন।

তরুণ সমাজকে আজ বিবেকানন্দের সেই পন্থা পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে— জনসাধারণকে বোঝাতে হবে— তবেই সঠিক অস্তিত্ব সংকটের মোকাবিলা করতে পারবো আমরা, পারতেই হবে। বিবেকানন্দই শুনিয়ে গেছেন আশ্বাসবাণী ''সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ, যদি বা আকাশ হেরো বিষণ্ণ গম্ভীর, ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়, জয় তব জেনো সুনিশ্চয়'' (বীরবাণী- ভাষান্তরে)। এ আশ্বাস শুধু আমাদের জন্য নয়, প্রকৃতিকে নির্মম ভাবে নিঙড়ে নিয়ে ভোগ্যবস্তু অর্জনে যারা পাগলের মতো ছুটে চলেছে বিপর্যয়ের লক্ষ্যে— সেই পাশ্চাত্য জগতের জন্যও। সার্ধজন্মশতবর্ষেও তিনি, বিবেকানন্দ, দাঁড়িয়ে আছেন এবং থাকবেনও আমাদের জন্য, তার পরেও এ প্রত্যয় শুধু আমাদের নয়, বহির্ভারতীয় বিদগ্ধ মনেরও, বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল যে দেশ সেই দেশের একজন বিদগ্ধ মানুষ, ভারততত্ত্ববিদ্ মস্কো বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, মস্কো সোভিয়েট সায়েন্স অ্যাকাডেমির অ্যাকাডেমিশিয়ান— E. P. Chelishov বলেছেন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ''বহু বছর পেরিয়ে যাবে। বহু প্রজন্ম অতিক্রান্ত হবে, বিবেকানন্দ ও তার যুগ সুদূর অতীতে পরিণত হবে। কিন্তু সারা জীবন ধরে যিনি স্বদেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দুঃখপীড়িত দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্য। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার গ্রাস থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য যিনি এত কিছু করেছেন— সেই মানুষটির স্মৃতি, বিবেকানন্দর স্মৃতি কখনওই ম্লান হবে না। সমুদ্রতীরের পাথুরে ঢাল অংশ যেমন তরঙ্গের আঘাত এবং ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে তীরভূমিকে সতত রক্ষা করে, সর্বদা নির্ভীক এবং নিঃস্বার্থ থেকে তেমনইভাবে বিবেকানন্দ তার দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। বিবেকানন্দ যুবকদের দিকেই তাকিয়ে আছেন অলক্ষ্য থেকে, কারণ তারাই গড্ডলিকা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চলতি অবক্ষয়ের গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।

গ্রন্থসূত্র :

১. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—
সম্পাদক : লোকেশ্বরানন্দ।

২. The Life of Vivekananda--
Romain Rolland.

৩. The Universal message of
Swami Vivekananda--
Ranganathanda.

[লেখক বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক]

স্বস্তিকা

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৭০০ ০০৬

ফোন : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

email : swastika5915@gmail.com vijoy.adya@gmail.com

২০১৩

2013

১৪১৯ JANUARY পৌষ-মাঘ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
23rd Netaji Birth Day	25th Fateha D-Daham	1 নিউইয়ার্স ডে	2 পৌঃ ১৭	3 ১৮	4 সারদা দেঃ জঃ	5 ২০
6 ২১	7 ২২	একাদশী	9 আয়-চায়-গুঃ	10 ২৫	অমাবস্যা	12 বিবেকানন্দ জঃ
13 ২৮	14 পৌষপার্বণ গঙ্গাসাগর স্নান	15 মাঃ ১	16 ২	17 ৩	18 ৪	19 ৫
20 ৬	21 ৭	একাদশী	23 নেতাজী জঃ	24 ১০	25 ফঃ-দোঃ-দাঃ	26 প্রজাতন্ত্র দিঃ
পূর্ণিমা	28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬	31 ১৭	26th Republic Day	

১৪১৯ FEBRUARY মাঘ-ফাল্গুন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		15th Saraswati Puja			1 মাঃ ১৮	2 ১৯
3 ২০	4 ২১	5 ২২	একাদশী	7 ২৪	8 রটন্তী কাঃ পূঃ	9 ২৬
অমাবস্যা	11 ২৮	12 ২৯	13 ফাঃ ১	14 গণেশ পূজা	15 সরস্বতী পূজা	16 ৪
17 ৫	18 ৬	19 ৭	20 ৮	একাদশী	22 ফঃ-ফৈঃ-দাঃ	23 ১১
24 ১২	পূর্ণিমা মাঘীপূর্ণিমা	26 ১৪	27 ১৫	28 ১৬		

১৪১৯ MARCH ফাল্গুন-চৈত্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31 ১৭		27th Doljatra	29th Good Friday		1 সঙ্কট নাশিনী পূঃ	2 ওঙ্কার পঞ্চমী
3 ফাঃ ১৯	4 ২০	5 ২১	6 ২২	7 ২৩	একাদশী	9 ২৫
10 শিবরাত্রি	অমাবস্যা	12 ২৮	13 রামকৃষ্ণ জঃ	14 ৩০	15 চৈঃ ১	16 ২
17 ৩	18 ৪	19 ৫	20 ৬	21 ৭	22 ৮	একাদশী
24 ১০	25 ১১	26 ১২	পূর্ণিমা দোলযাত্রা	28 হোলি উৎসব	29 গুডফ্রাইডে	30 ১৬

১৪১৯-২০ APRIL চৈত্র-বৈশাখ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 বাঃ-ব্যাঃ-হিঃ	2 চৈঃ ১৯	3 ২০	4 ২১	5 ২২	একাদশী
7 ২৪	8 ২৫	9 ২৬	অমাবস্যা	11 ২৮	12 ২৯	13 নীল পূজা
14 চড়ক পূজা	15 নববর্ষারম্ভ	16 বৈঃ ২	17 বাসন্তী পূজা	18 অন্নপূর্ণা পূজা	19 রামনবমী	20 ৬
21 ৭	একাদশী	23 মহাবীর জয়ন্তী	24 ১০	পূর্ণিমা	26 ১২	27 ১৩
28 ১৪	29 ১৫	30 ১৬		1st Yearly Bank A/c.	15th Bengali New Year	

১৪২০ MAY বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1st May Day		1 মে দিবস	2 বৈঃ ১৮	3 ১৯	4 ২০
একাদশী	6 ২২	7 ২৩	8 ২৪	অমাবস্যা রবীন্দ্রনাথ জঃ	10 ২৬	11 ২৭
12 ২৮	13 অক্ষয় তৃতীয়া	14 ৩০	15 ৩১	16 জ্যৈঃ ১	17 ২	18 ৩
19 ৪	20 ৫	একাদশী	22 ৭	23 ৮	24 ৯	পূর্ণিমা

১৪২০ JUNE জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30 ১৫						1 জ্যৈঃ ১৭
2 ১৮	3 লোকনাথ তিঃ	একাদশী	5 ২১	6 ২২	7 [illegible]	অমাবস্যা
9 ২৫	10 ২৬	11 ২৭	12 ২৮	13 ২৯	14 জামাইষষ্ঠী	15 ৩১
16	17	18	একাদশী	20	21	22

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
26 নজরুল জঃ	27 ১২	28 ১৩	29 ১৪	30 ১৫	31 ১৬	

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
পূর্ণিমা স্নানযাত্রা	24 ৯	25 সাবেবরাত	26 ১১	27 ১২	28 ১৩	29 ১৪

১৪২০ JULY আষাঢ়-শ্রাবণ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 বিধানচন্দ্র জঃ/মৃঃ	2 আঃ ১৭	একাদশী	4 ১৯	5 ২০	6 ২১
7 ২২	অমাবস্যা	9 ২৪	10 রথযাত্রা	11 ২৬	12 ২৭	13 বিপত্তারিনী ব্রঃ
14 ২৯	15 ৩০	16 বিপত্তারিনী ব্রঃ	17 ৩২	18 পুনর্যাত্রা	একাদশী	20 শ্রাঃ ৩
21 ৪	পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা	23 ৬	24 ৭	25 ৮	26 ৯	27 নাগপঞ্চমী
28 ১১	29 ১২	30 ১৩	31 ১৪			

১৪২০ AUGUST শ্রাবণ-ভাদ্র

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9th Id-Ul-Fitter	15th Indepen-dence day	28th Janmas-thami	1 শ্রাঃ ১৫	একাদশী জুমাতুল-বিদা	3 ১৭
4 ১৮	5 ১৯	অমাবস্যা শবেকদর	7 ২১	8 ২২	9 ইদলফেতর	10 ২৪
11 ২৫	12 ২৬	13 ২৭	14 ২৮	15 স্বাধীনতা দিঃ	16 ঝুলনযাত্রা আঃ	একাদশী মনসা পূজা
18 ভাঃ ১	19 ২	পূর্ণিমা ঝুলনযাত্রা সমাঃ	21 রাখীবন্ধন	22 ৫	23 ৬	24 ৭
25 ৮	26 ৯	27 ১০	28 জন্মাষ্টমী লোকনাথ আঃ	29 নন্দোৎসব	30 ১৩	31 ১৪

১৪২০ SEPTEMBER ভাদ্র-আশ্বিন

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
একাদশী	2 ভাঃ ১৬	3 ১৭	4 ১৮	অমাবস্যা শিক্ষক দিবস	6 ২০	7 ২১
8 ২২	9 গনেশ পূজা	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬	13 ২৭	14 ২৮
একাদশী	16 ৩০	17 বিশ্বকর্মা পূজা	18 আঃ ১	পূর্ণিমা	20 ৩	21 ৪
22 ৫	23 ৬	24 ৭	25 ৮	26 ৯	27 ১০	28 ১১
29 বিদ্যাসাগর জঃ	একাদশী যাঃ-ব্যাঃ-হিঃ			30th Half Yearly Bank A/c.		

১৪২০ OCTOBER আশ্বিন-কার্ত্তিক

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
2nd Gandhi Birth Day 4th Mahalaya	11th to 14th Durga Puja	1 আঃ ১৪	2 গান্ধীর জন্মদিন	3 ১৬	অমাবস্যা মহালয়া	5 ১৮
6 ১৯	7 ২০	8 ২১	9 ২২	10 দূর্গাষষ্ঠী	11 মহাসপ্তমী	12 মহাষ্টমী
13 মহানবমী	14 বিজয়া দশমী	একাদশী	16 ইদুজ্জোহা	17 ৩০	পূর্ণিমা লক্ষ্মী পূজা	19 কাঃ ১
20 ২	21 ৩	22 ৪	23 ৫	24 ৬	25 ৭	26 ৮
27 ৯	28 ১০	29 ১১	একাদশী	31 ১৩	16th Id-Uz-Zuha	18th Laxmi Puja

১৪২০ NOVEMBER কার্ত্তিক-অগ্রঃ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	2nd Kali Puja	14th Muharram	17th Guru Nanak Birth day		1 ধনতেরাস	2 কালী পূজা
অমাবস্যা দিপাবলী	4 কাঃ ১৭	5 ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	6 ১৯	7 ২০	8 ২১	9 ছট পূজা
10 ২৩	11 জগদ্ধাত্রী পূজা	12 ২৫	একাদশী	14 মহরম	15 ২৮	16 কার্ত্তিক পূঃ/রাসযাত্রা
পূর্ণিমা গুরুনানক জঃ	18 অগ্রঃ ২	19 ৩	20 ৪	21 ৫	22 ৬	23 ৭
24 ৮	25 ৯	26 ১০	27 ১১	28 ১২	একাদশী	30 ১৪

১৪২০ DECEMBER অগ্রঃ-পৌষ

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1 অগ্রঃ ১৫	অমাবস্যা	3 ১৭	4 ১৮	5 ১৯	6 ২০	7 ২১
8 ২২	9 ২৩	10 ২৪	11 ২৫	12 ২৬	একাদশী	14 ২৮
15 ২৯	16 ৩০	পূর্ণিমা	18 পৌঃ ২	19 ৩	20 ৪	21 ৫
22 ৬	23 ৭	24 সারদা দেঃ জঃ	25 বড়দিন	26 ১০	27 ১১	একাদশী
29 ১৩	30 ১৪	31 ১৫		25th X-mas Day		

প্রত্যেকটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বৈঠকখানার কার্পেটের নিচে কাঙাল হরিনাথের মৃতদেহ, তার উপরে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি, ঐ মৃতদেহ উদ্ধার করার দায়িত্ব আপনার! পড়ুন

মহর্ষি হরিনাথ মজুমদার

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ

দাম : দুশো টাকা

তুহিনা প্রকাশনী

১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩

মো : ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

শিবাজী গুপ্ত'র কলমে

প্রায় দশ বছর ধরে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা'য় প্রকাশিত শিবাজী গুপ্ত'র অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায়-লবণ-কটু রসায়িত রচনাগুলি দুইখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে—

প্রতি খণ্ড : ১৫০.০০ টাকা

তুহিনা প্রকাশনী

১২/সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩, মো : ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

Sri Ramkrishna Engineers Co-op Society Ltd.

Civil & Electrical Work and Lan & Won Project

Govt. Contractor, Ph. 9230613530

Barasat, Kolkata - 700 124

বিবেকানন্দ যুব শিবির : ২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩

অংশগ্রহণের বয়স ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত

১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

স্থান : গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়

স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

LEVIN AGRO INDIA LTD.

Swadeshi Chintan, Viswa Niyantran

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া লিমিটেড

(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

ধর্মহীন রাষ্ট্র : বিবেকানন্দের সতর্কবাণী

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

স্বামী বিবেকানন্দের নামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে কর্মসূচী ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল, তাতে দেখা গেল লেখা রয়েছে— ‘‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে আজ যখন আমরা এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন, সভ্যতার সঙ্কটে রয়েছে প্রচ্ছন্ন সন্ত্রাসবাদের হাতছানি— তখন একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেমের আহ্বান ও সমন্বয়বাদের আদর্শই পারে আমাদের সকলকে এক অখণ্ড সম্প্রীতির পতাকাতলে নিয়ে আসতে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে যত মত, তত পথের আদর্শকে সার্থক রূপায়ণে নিজেদের সামিল করি।’’

এসব অতি উচ্চভাব ও আদর্শের কথা। অতীতে অনেক বাঘাবাঘা ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক ধুরন্ধর ব্যক্তি ধর্মে ধর্মে সমন্বয় এবং সমভাবের ডঙ্কা পিটিয়েছেন। কিন্তু সঙ্কটকালে সেসব কোনও কাজেই লাগেনি।

‘যত মত, তত পথ’ অতি খাঁটি কথা। যে যার মতে মতিস্থির রেখে নিজ নিজ পথে এগিয়ে গেলে বিরোধের কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু জোর জবরদস্তিপূর্বক একের পথ মত অন্যের উপর চাপাতে গেলেই বিরোধ বাধে। নিজের পথই ঠিক, অন্যে ভুল পথে যাচ্ছে; সুতরাং তাকে জোর করে নিজের পথে আনতে হবে— এসব গাজোয়ারি মনোভাব থেকেই তো সংঘর্ষের সূত্রপাত।

শত শত বছর ধরে যে ধর্মীয় সংঘর্ষের শিকার হয়েছিল ভারতীয় হিন্দুরা, তা সত্ত্বেও তাদের পাইকারি হারে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

‘‘তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ, উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থত্যাগ করিয়াছ। এই ধর্ম রক্ষার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সাহসপূর্বক সকলই সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে— কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে।’’

সোমনাথের গভীর শিক্ষা

স্বামীজী পুনরায় সোমনাথ মন্দিরের নজির টেনে বললেন— ‘‘অনেক গ্রন্থপাঠে যাহা না শিখিতে পারো গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের মতো দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, ওই মন্দির শত শত আক্রমণের ও শত শত পুনরুত্থানের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে— বার বার নষ্ট হইতেছে, আবার সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নূতন-জীবন লাভ করিয়া পূর্বেরই মতো অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং এইখানেই এই ধর্মেই আমাদের রাষ্ট্রীয় মন, রাষ্ট্রীয় প্রাণপ্রবাহ দেখিতে পাইবে। ধর্ম অনুসরণ কর, তোমরা গৌরবান্বিত হইবে। ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। এই রাষ্ট্রীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহার একমাত্র পরিণাম হইবে বিনাশ।’’

‘‘আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে আর কিছুর প্রয়োজন নাই। আমি একথা বলিতেছি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতির কোনও প্রয়োজন নাই; আমার এটুকু বক্তব্য— আর আমার ইচ্ছা, তোমরা ইহা ভুলিও না যে, ওইগুলি গৌণমাত্র, ধর্মই মুখ্য।’’

সেকারণেই স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ভারতবাসীকে আহ্বান করে বলেছেন—

ধর্মকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকো

‘‘সুতরাং এইটিই বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে— যে ভিত্তির উপর রাষ্ট্রীয় সুবিশাল সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং ফল দাঁড়াইবে— সম্পূর্ণ ধ্বংস।

অতএব হে বন্ধুগণ, ইহাই আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ—

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে অমূল্য ধর্মসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহাকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ যে দেশে বড় বড় রাজারা নিজদিগকে প্রাচীন রাজগণের অথবা পুরাতন দুর্গনিবাসী, পথিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী দস্যু ব্যারন-গণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ না করিয়া অরণ্যবাসী অর্ধনগ্ন মুনিঋষির বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত মনে করেন? তোমরা কি এমন দেশের কথা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাকো, শোন—আমাদের মাতৃভূমিই সেই দেশ।

অন্যান্য দেশে বড় বড় ধর্মাচার্যগণ নিজেদের কোনও প্রাচীন রাজার বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, এখানে বড় বড় রাজারা নিজেদের কোনও প্রাচীন ঋষির বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট।

এই কারণেই আমি বলিতেছি, তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিখিবার তাহা লও; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে, তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব- মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা— শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; আমার বিশ্বাস— ভারত শীঘ্রই অভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ যখন এই দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ পরাধীন; বিধর্মী শাসনাধীনে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও অভিপ্রায় কার্যে রূপদানের স্বাধীনতা ছিল না। স্বামীজীও আশা ব্যক্ত করেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সে শুভদিন আসবে যখন ভারতের হিন্দুরা নিজের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন করবে। কার্যত ঘটেছিল তা-ই। তাঁর অন্তর্ধানের ৪৫ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু এ কোন্ ভারত? বিকলাঙ্গ ছিন্নভিন্ন ইসলাম ধর্মের পাশব আক্রমণে ভীত, সন্ত্রস্ত, ধন-মান-ইজ্জত লুণ্ঠিত নারীর আর্তনাদের মাঝে কংগ্রেসী হিন্দুদের হাতে দেশ শাসনভার এলো।

এই কালাপাহাড় কংগ্রেসীরা ক্ষমতা হাতে পেয়েই, হিন্দুধর্মের সর্বনাশ ও হিন্দুদের ক্ষতিসাধনে কোমর বেঁধে লাগে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দান তো দূরের কথা, রাষ্ট্র শাসনের চৌহদ্দী থেকে ধর্মকে বিতাড়িত করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম্ নামে এক বিকৃত মতবাদ হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে ইসলাম ও খৃস্টধর্মের বাড়বাড়ন্তের পথ সুগম করে দেয়। অথচ স্বামীজী কিন্তু হিন্দুদের নির্ভুল পথের নিশানা দিয়ে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কার্যপ্রণালীর নিম্নরূপ রূপরেখা অঙ্কন করে দিয়েছিলেন :

"**আমার কার্যপ্রণালী :** হিন্দুদের দেখানো যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীব্যাপী দাসত্বের ফলস্বরূপ এই 'জড়ত্ব' দূর করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল। তাহার কারণ তখন ছিল জীবনমরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই : এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে স্বধর্মত্যাগী ও মিশনারীগণের উপদিষ্ট ধ্বংসের পথে নয়— আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। বহু শতাব্দীর প্রাসাদ নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্মাণকার্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাক্রমে সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্যপ্রণালী। প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ধর্মই ভারতের মূল স্রোত, উহাকে শক্তিশালী করা হউক, তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।"

আমরা স্বামীজী প্রদর্শিত পথে না চলে ধর্মহীন রাষ্ট্র গড়েছি বলেই আমাদের বর্তমান দুর্দশা ও দুর্গতি।

স্বামী বিবেকানন্দের অনেক বক্তৃতার হদিস নেই

গোপালকৃষ্ণ রায়

১৯০২ সালে শিলং-এ গৃহীত স্বামীজী'র ছবি। গবেষকদের ধারণা, জীবদ্দশায় এটাই বিবেকানন্দের শেষ আলোকচিত্র।

ভারত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার সন্ধান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আত্মস্থ মন নিয়ে দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, কর্মনীতি ও সর্বোপরি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়গুলি নির্দিষ্ট করেছিলেন। পরিক্রমার সময় ভারতের এক শাশ্বত রূপ তাঁর চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমার অধিকাংশ সময় কেটেছে দক্ষিণ, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম-ভারতে। জীবনের শেষ পর্বে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত পরিক্রমা শুরু করেছিলেন।

১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। সেই পরিক্রমায় তিনি তৃপ্ত হননি। নিজেই স্বীকার করেছিলেন, নিজের প্রদেশ (অখণ্ড বঙ্গদেশ) ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি।

১৯০১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় "হোয়াট হ্যাভ আই লারন্ট" (What have I learnt) শীর্ষক বক্তৃতায় বঙ্গপ্রদেশ ভাল করে না দেখার খেদ প্রকাশ পেয়েছে।

তাঁর ভারত পরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণ, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা বিশদে তাঁর রচনা সমগ্রে স্থান পেয়েছে। কিন্তু পূর্ব ও উত্তর ভারত পরিক্রমা ও বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা সমগ্র রচনায় সংকলিত হয়নি।

ঢাকায় ১৯ মার্চ ও ৩১ মার্চ প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা ব্যতীত, তাঁর সেখানে অবস্থান, ঘরোয়া আলোচনা ও কথোপকথনের উল্লেখ আমরা পাই না। অথচ ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববন্দিত। জনপ্রিয়তার শিখরে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই সময় তাঁর সঙ্গে অনেকেই ছিলেন। তাঁর প্রতিদিনের কর্মসূচিও নির্ধারিত থাকতো। কিন্তু সমগ্র রচনায় ওই সময়ের বিস্তারিত বিবরণ অনুপস্থিত।

১৯০১ সালের ১৯ মার্চ ও ৩১ মার্চ তিনি জগন্নাথ কলেজ ও একটি স্কুলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু'টি বক্তৃতার মধ্যে তেরো দিনের ফারাক। নিশ্চয়ই তিনি এই তেরোদিন ঘরের মধ্যে চুপ করে

বসেছিলেন না। থাকবার কথাও নয়।

১৯ মার্চের আগেই তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রাপথের বিক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গেলেও, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের কর্মতালিকার বিশদ উল্লেখ মেলে না।

ঢাকার মতো শহরে স্বামীজী মাত্র দুটি বক্তৃতা করেছিলেন, এটাও খুব বিশ্বাস্য নয়। অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে, বাকি বক্তৃতাগুলি কোথায় গেল? অন্যান্য কর্মসূচিই-বা কী ছিল? সেই সময় স্বামীজীর সঙ্গে একাধিক শ্রুতি-লেখকও থাকতেন। ঢাকার মহাফেজখানায় ১১১ বছরের পুরনো নথিপত্র আছে কিনা, সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক ঝড়ে ঢাকা বহুবার বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হয়েছে। কোনও উৎসাহী গবেষক এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন।

ঢাকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তীর্থ করতে চন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। ১৯০১ সালের ৫ এপ্রিল তিনি ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন। চন্দ্রনাথ পৌঁছতে তাঁকে অবশ্যই চট্টগ্রামের উপর দিয়ে যেতে হয়েছিল। চট্টগ্রামে অবশ্যই অবস্থান করতে হয়েছিল।

১১১ বৎসর পূর্বে হলেও, চট্টগ্রাম সেই সময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে বেশ অগ্রণী ছিল। চন্দ্রনাথের পথে তিনি চট্টগ্রামে নীরবে অবস্থান করেছিলেন, ওই কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। চট্টগ্রামের মানুষ সেই সময় বিবেকানন্দের উপস্থিতি উপেক্ষা করতে পারেন না। বিবেকানন্দ-গবেষকরা স্বামীজির চট্টগ্রামে অবস্থান নিয়ে অবশ্যই উৎসাহ দেখাতে পারেন।

১১১ বৎসর পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রনাথের পথ আজকের মতো সুগম ছিল না। পাহাড় বন জঙ্গল অতিক্রম করেই স্বামীজীকে ওই অঞ্চল পরিক্রমা করতে হয়েছে। সেই পরিক্রমা সহজসাধ্য ছিল না। সেই পথ-পরিক্রমার বিশদ বিবরণ আমাদের কাছে অনুপস্থিত।

এগারো দশক পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রনাথ স্বামীজী কীভাবে পৌঁছেছিলেন— তা জানার কৌতূহল সকলেরই থাকতে পারে। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ খুব একটা সুস্থ ছিলেন না।

চন্দ্রনাথ থেকে কামাক্ষ্যা। কামাক্ষ্যায় জনৈক পাণ্ডাকে তিনি একটি শংসাপত্র দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের পত্রাবলীর মধ্যে, এই তথ্যটির উল্লেখ আছে।

গৌহাটিতে দিনকয়েক বিশ্রাম নিয়ে অসমের তদানীন্তন রাজধানী শৈল শহর শিলং-এ গিয়েছিলেন। এই নিবন্ধে স্বামীজীর শিলং-এ অবস্থান ও কর্মসূচির কথা উল্লেখ করতে চাই। শিলং-এ স্বামীজী দিন-কুড়ি অবস্থান করেছিলেন। শিলং-এ অবস্থানকালে কুইন্টন হলে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে পনেরোটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। অসমের তদানীন্তন চীফ্ কমিশনার কটন সাহেব পরপর কয়েকদিন তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। মুগ্ধ কটন স্বামীজীকে তাঁর বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। একটি সরকারি রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় যে, কটন সাহেব জাতীয়তাবাদ নিয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেছিলেন। শিলং-এর কুইন্টন হলের বক্তৃতায় ন্যাশনালিজম্-ই প্রাধান্য পেয়েছিল। পনেরো দিনের পনেরো ঘণ্টার বক্তৃতার কোনও অংশই বিবেকানন্দ রচনা সমগ্রে উল্লেখ নেই।

শিলং-এ স্বামীজীর সঙ্গে অনেকেই ছিলেন। তবুও শিলং-এর বক্তৃতাবলীর কোথাও উল্লেখ নেই কেন?

কর্মোপলক্ষে আমাকে বছর চারেক শিলং-এ থাকতে হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধানও করেছিলাম। শিলং-এর কিছু প্রবীণ ব্যক্তি মনে করেন অসমের মহাফেজখানায় অনুসন্ধান করলে, কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

শিলং-এর লাবাল এলাকায় একটি বাড়িতে থাকতেন স্বামীজী। বাড়িটি এখনও আছে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে স্বামীজীর একটি মূর্তি বাড়িটির পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মূর্তিটি বড়ই কাঁচা হাতের তৈরি। মেঘালয় সরকার স্বামী বিবেকানন্দ-র নামে একটি রাস্তার নামকরণ করে— শিলং-এ তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থানকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। মেঘালয় সরকারকে ধন্যবাদ।

বিবেকানন্দ-গবেষকেরা স্বামীজীর হারিয়ে যাওয়া বক্তৃতাগুলি উদ্ধার করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে, সার্ধশতজন্মবর্ষ উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

[লেখক প্রবীণ সাংবাদিক]

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সাম্যতত্ত্ব

ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে বাংলার ঘরে যে শিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁকে দেখে ভবিষ্যৎ বক্তারা মন্তব্য করেছিলেন যে ভবিষ্যতে সে দেশপ্রেমিক সৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। তাদের ভবিষ্যৎ বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি বিশ্বের দরবারে সন্ন্যাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন— ছড়ালেন প্রেমের বার্তা এবং মানবতার জয়গান। তাঁর বার্তার মধ্যে বেজে উঠলো সাম্যর সুর মানবতার গান ও দেশাত্মবোধের জয়গাথা। ছেলেবেলার দুরন্তপনার মধ্যে জন্ম নিল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যবোধের গাম্ভীর্য এবং স্রোতস্বিনী সমুদ্রের ভাবতরঙ্গ। ইতিহাস তাকে বুকে নিয়ে এক পার থেকে অপর পারে গিয়ে আছড়ে পড়েছে— সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর কর্ম জীবনে অসীমের পাড় ভেঙেছে— তিনি হয়েছেন বিশ্ব মানবতার দূত বিবেকানন্দ। প্রথমে বিলে তার পর নরেন্দ্রনাথ তার পর বিবেকানন্দ। বিলে > নরেন্দ্র > বিবেকানন্দ। এক তরুণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক রূপে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বের প্রাঙ্গণে সুদৃঢ় সংগ্রামী যোদ্ধা ও সন্ন্যাসী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

বিলে ও নরেন্দ্রের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যাঁর হওয়ার কথা ছিল সৈনিক সে পরবর্তী জীবনে রূপান্তরিত হলো সন্ন্যাসী রূপে। এই বাংলার প্রেক্ষাপটে আর একজন নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সন্ন্যাসী রূপে। তিনি পরবর্তী জীবনের কালপ্রবাহের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হলেন সৈনিক— হলেন নেতাজী। একজন সৈনিক হতে চেয়েও হলেন সন্ন্যাসী। আর এক সন্ন্যাসী হতে চেয়ে হলেন সৈনিক। একজন স্বামীজী,

অন্যজন নেতাজী; এই দুই ব্যক্তিত্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে যুবশক্তিকে চরিত্র গঠনের আহ্বান জানিয়ে দেশকে বিদেশীর হাত থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের তথা বিশ্বের ইতিহাসে মানবতার তথা স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন।

মানুষের যুব চেতনাকে প্রেরণা জুগিয়ে স্বাদেশিকতা ও অধ্যাত্মবোধের উন্মেষ ও জাগরণ ঘটিয়েছেন। এই দুই ব্যক্তিত্ব দেশের তথা দেশের বাইরের প্রেক্ষাপটে আত্মিক শক্তির এবং সমষ্টির ব্যাপ্তির সম্মেলনে ব্যষ্টির ও সমষ্টির জাগরণে একটি সত্তার পরিপূর্ণতা এনেছেন। একজনের আয়ু মাত্র ৩৯ বছর আর একজনের জন্ম আছে মৃত্যু নেই— মৃত্যু কবে কোথায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কে জানে। সেই ব্যক্তির জীবন সংগ্রাম রহস্যাবৃত।

দুই

বিলের ছেলেবেলার খেলা ছিল— ভাব সাগরে ডুব দেওয়ার খেলা; কয়েকটি ছেলে মিলে একসঙ্গে পদ্মাসনে বসে শিব হওয়ার খেলা— অশ্বত্থ গাছের তলায় শিব শঙ্কর মহাদেব সেজে অমর হওয়ার খেলা। একদিন তারা বসে আছে চোখ বুজে। একটি বিরাট বিষধর সাপ তাদের পাশে রয়েছে— কারও কোন হুঁস নেই; পথের ধারে চলমান পথিক এই দৃশ্য দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং চীৎকার করলে বাড়ীর ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে লোক ছুটে এলে ছেলেদের ধ্যান ভাঙলো। সবাই পালালো কিন্তু শিব সাজা ধ্যানমগ্ন বিলের কিন্তু নড়চড় নেই— সে আপন মনে চোখ বুঁজে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলো— যখন তাঁর ধ্যান ভাঙলো তখন সাপটি চলে গেছে— সেই খেলার ছলে নির্ভীক বিলে যে আত্মময় হয়ে উঠতো পরবর্তীকালে সেই আত্মময়তাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠলো।

বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি, কোথা তুমি খুজিছো ঈশ্বর

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

জীবের মধ্যে শিবের অস্তিত্বের তত্ত্ব খুঁজে পেলেন ছোট্ট বিলে নরেন্দ্র রূপান্তরিত হয়ে—শিব সেজে ধ্যানমগ্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে ভাবতত্ত্ব জন্ম নিল বিলের অন্তরের মধ্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে নরেন্দ্রকে তার বন্ধুরা নিয়ে গেল রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে। মাতৃসাধক রামকৃষ্ণ সেই বালক নরেন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পেলেন পরশমণি— দেখলেন বিশ্বাত্মার রূপ— তিনি তাঁর চোখে বিবেকের আনন্দময় উন্মেষ লক্ষ্য করলেন, কিন্তু সাধক রামকৃষ্ণকে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই অসাধারণ অবতার রূপে মানতে চাইলেন না— গুরু শিষ্যের ভাবের সংঘাত ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে উঠলো। ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রের বাবার মৃত্যু রূঢ় বাস্তবের দিকে ঠেলে দিল

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,
ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯

Email : banbhoomitravels@gmail.com

নরেন্দ্রকে— দারিদ্র্য রূঢ়তা বাস্তবের কষাঘাতে কঠিনতর সংগ্রামে দাঁড় করিয়ে ছিল তাকে— গুরু রামকৃষ্ণ মাটির মায়ের কাছে দারিদ্র্য মুক্তির পথ চাইতে নির্দেশ দিলেন— কিন্তু নরেন্দ্র মৃণ্ময়ীর কাছে অভাব দূর করার কথা বলতে পারলেন না— তিনি যতবার মৃণ্ময়ীর কাছে চাইতে গেলেন ততবারই চাইলেন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি— গুরু ও শিষ্যের মনময় চাওয়া-পাওয়ার খেলা শুরু হলো। বাড়িতে অভাব, অনটন ক্রমশ বাড়তে লাগলো। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না ছেলে। আত্মীয় স্বজনে হিংসা মামলা মকদ্দমায় জর্জরিত করল নরেন্দ্রকে। গুরু রামকৃষ্ণ বাঘবন্দীর খেলার ছলে শিষ্যকে মামলার জাল থেকে মুক্ত করার পথ মায়ের কাছে খুঁজছেন প্রতিনিয়ত, শেষ পর্যন্ত মা পথ দেখালেন— পরিব্রাজক নরেন্দ্র বিবেকানন্দ রূপ নিয়ে সন্ন্যাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করে বিশ্বের প্রাঙ্গণে পা রাখলেন— চিকাগো সম্মেলনে যোগ দিতে— হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি রূপে। কিন্তু প্রবেশপত্র ছিল না তাঁর কাছে, ছিল না কোনও প্রতিষ্ঠিত অধিকারও— তবে মায়ের আশীর্বাদ ও পরিব্রাজকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জীবনবোধ ও বিশ্বমানবতার পিপাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তরুণ সন্ন্যাসী জগতের প্রাঙ্গণে। তাই কোনও বাধাই তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই তরুণ সন্ন্যাসী সেই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে উন্মুক্ত হয়ে গেল ভারতীয় দর্শনের আলো বিশ্বের দুয়ার প্রাঙ্গণে— ধর্মের নতুন রূপ ও সংজ্ঞা উন্মোচিত হলো। হিন্দু সংস্কৃতি ধর্ম আত্মপ্রকাশ করল নতুন রূপে। মার্গারেট নিবেদিতা নাম নিয়ে এই ভারতের বুকে এসে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দের বাণীর আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। হিন্দু ধর্মকে যে বিশ্ব কোনওদিন ঠাঁই দেয়নি সেই ধর্মকে ঠাঁই দিয়ে মানবতার দরবারে স্বীকৃতি দিল।

তিন

হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি শিকাগো সম্মেলনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নতুন প্রেক্ষাপটে জন্ম নিল। মানবধর্ম ও অধ্যাত্মধর্ম একাকার হলো— সেই সঙ্গে সমাজধর্ম নব্য খোলসে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করল। বিবেকানন্দের হাত ধরেই ভারতীয় ভাবনার প্রেক্ষাপটে নতুন রঙে নতুনরূপে ভারতীয় ধর্ম জন্ম নিল। দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই— ভারতের মাটি আমার ভূমি শয্যা এই ডাক দিয়ে সমাজ ভাবনা ও অধ্যাত্মভাবনাকে একাকার করলেন নরেন্দ্রনাথ। যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোনও স্থান থাকে যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্র, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণ হয়েছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ।'

অধ্যাত্ম-দর্শনে বিশ্বাসী নরেন্দ্রের ভাব মূলে রয়েছে দেশাত্মবোধ। তাই অধ্যাত্ম দর্শন ও দেশাত্মবোধ একাকার হয়ে নরেন্দ্র মানসিকতায় জন্ম নিয়েছে সমাজ দর্শন। নরেন্দ্রনাথের স্বদেশ মন্ত্র এক নতুন রূপে এক নতুন রঙে প্রেম মন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত। ''হে ভারত এই পরানুবাদ এই পরাণুকরণ এই পরমুখপেক্ষিতা এই দাস সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধর্ম, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না নীচ জাতি মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— ''আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল— মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কোটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল'' ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ

নেত্রদান মহাদান

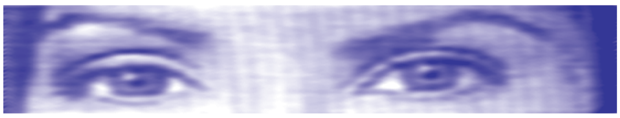

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

কর।’

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা)

চার

১. বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছো ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।”

২. দেবতারে যাহা দিতে পারি
তাহা দেই প্রিয়জনে
প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি
তাহা দেই দেবতারে
আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা।”

৩. শোনো হে, মানুষ ভাই
সবার উপরে
মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।।

বিবেকানন্দের জীবন বোধ, সমাজ দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ একাকার হয়ে যে মহাদেশমন্ত্র রচনা করেছে— তার মূলে রয়েছে যে বৃত্ত সেই বৃত্তের নাম ‘সাম্যতন্ত্র’— এই সাম্যতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সনাতনী ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন ভাবনা ও অধ্যাত্ম দর্শন, শ্রী মহাভাগবত উদগাতা গীতার নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব ও মানবতা বোধের নেপথ্যে এবং পুরাণের অন্তরের অন্তরস্থলে যে প্রবাহ পরিপ্লুত তার অন্তর্লীন সুর হলো সাম্যের জয়গান— সেই জয়গানকে অভিজাত করে বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মানবতার ও অধ্যাত্মবাদের মহামন্ত্র ধ্বনি, যে ধ্বনির মূল তরঙ্গে রয়েছে সাম্যের গান— তাই পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কোনও জাত, ধর্ম না মেনে সব হুঁকোগুলো টেনে দেখতে চেয়েছেন জাত কিসে যায়?

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, আধ্যাত্মিক বিবেকানন্দ, মানুষ বিবেকানন্দ, সমাজবিদ নরেন্দ্র ও বিবেকানন্দ সনাতনী চেতনায় গড়া মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ করেছেন যে ঈশ্বরকে সেই ঈশ্বরের মধ্যে কোনও জাত-ধর্ম নেই, আছে শুধু সত্যদর্শন যে সত্য দর্শন সাম্যচেতনারই আত্মপ্রকাশ। তাই কালপ্রবাহে অনেক তত্ত্ব ভেসে গেলেও বিবেকানন্দের জীবনতত্ত্ব ও গুরু রামকৃষ্ণের ভাবদর্শন আজও ভেসে যায়নি। আজও সেই দর্শন অমর ও অব্যয়। পাশ্চাত্য দর্শনের সাম্যবাদ বস্তুতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের সাম্যতন্ত্র অধ্যাত্মচেতনার প্রেক্ষাপটে আলোকিত জীবন দর্শন।

[লেখক সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন।]

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি, ২৭ জানুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

স্বামীজীর ভাবনায় অধ্যাত্মভিত্তিক রাষ্ট্র

সুরেন্দ্রনাথ সিংহ

পৃথিবীর ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ হলেন একজন বিরল প্রতিভা। স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি আদর্শরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে তার সর্বোচ্চ বিকাশে উন্নতি করতে। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান প্রফেট। স্বামীজী ভারতবর্ষের ইতিহাস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের শক্তিশালী রূপের স্বপ্ন দেখেছিলেন। একজন স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন উদার মানবপ্রেমী ও অসাধারণ দেশপ্রেমিক, বরেণ্য গণতন্ত্র প্রেমী মানবতাবাদী মানুষ হিসাবে স্বামীজীর জীবন ও কর্মপন্থা ভারতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই— এই কথা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না। স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি 'মানুষ'। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। এই মানবধর্মকে স্বামীজী সর্বদাই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই মানব ধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের উত্তরণ চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি তাঁর চোখে মানব সমাজের একটি অঙ্গমাত্র, প্রধান অঙ্গ অবশ্যই নয়। মানুষের জীবনের আংশিক চাহিদা মেটানো ছাড়া সরকার যে বেশি কিছু করতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই সরকার বা সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত রাষ্ট্রনীতি, সমস্ত সমাজনীতি গড়ে তুলতে হবে মানবতাবাদকে ভিত্তি করে। স্বামীজীর এই মানবতাবাদ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মানবতাবাদ নয়। পাশ্চাত্য মানবতাবাদ চেয়েছে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন গুণ প্রবিষ্ট করতে, অন্যদিকে স্বামীজী চেয়েছেন মানুষ তার স্বরূপ ফিরে পাক— যে স্বরূপ জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান এনে দেয়।

মানবতার বা মানুষের যে কোনও সংস্কার বা উন্নতি করার জন্য স্বামীজী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, 'প্রথমত ধর্মের উন্নতি প্রয়োজন। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।' (তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২২০, ২২১ স্বামীজী রচনাবলী) অন্য এক জায়গায় ভবিষ্যৎ শক্তিশালী ভারত গড়ার জন্যে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি এক প্রবল হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন— "আমাদের কাজের মূল কথাটা সবসময় মনে রেখো— ধর্মে একটুকু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। মনে রাখবে দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। জাতির ভাগ্য নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাদের তুলতে পার? তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করে তার লুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসে ও সাধনে ঘোর হিন্দু হতে পার? এইটিই হবে এবং আমরাই তা করব।' (চিঠিপত্র, পৃঃ ৬৪)

আধুনিক ভারতবর্ষের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আজ গভীর ভাবে বিচার করার সময় এসেছে যে, ভারতবর্ষের ভাগ্য কোন পথে পরিচালিত হবে। স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ও মানবতাবাদই আজ ভারতবর্ষ তথা ভোগবাদে নিষ্পেষিত পৃথিবীর আলোকবর্তিকা। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় : "পাশ্চাত্য মানবতাবাদ লোহার খাঁচাকে সোনার খাঁচায় পরিণত করেছে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদান্তই তাকে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ একে অপরের পরিপূরক।" বেদান্তের যে রূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে মূর্ত হয়েছিল সেই "জীবই শিব" তত্ত্বের ব্যবহারিক কর্ম প্রণালীকে ভিত্তি করেই স্বামীজীর মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত।

আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করতে গিয়ে স্বামীজী ভারতবর্ষের ইতিহাসের

অতি সুদূরপ্রসারী সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এককথায় তাঁর এই ইতিহাস বিশ্লেষণ অদ্বিতীয়। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। ভারতের নিপীড়িত মানুষের জন্য তিনি সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বিবেকানন্দের মানবতাবাদ ভারতবর্ষের মানুষকে এক আদর্শ রাষ্ট্র গড়তে উদ্দীপ্ত করে যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম নয় শ্রেণী সমন্বয়ই শেষ কথা। কেননা প্রত্যেক জাতিরই তার নিজস্ব জাতীয় ধারা থাকে। এই কথার সমর্থনে আমরা মাও-সে-তুং এর কথা স্মরণ করতে পারি।

"New democratic culture is national...It belongs to our own nation and bears own national characteristics" (Selected Works-Mao-Tse-Tung. Vol. II Calcutta, 1973-P-350)

সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিন-ও একই কথা বলেছেন—"To run a country like Russia you need to have a national policy and to feel constantly at your back all the eleven hundred years of its history, not just the last fifty-five percent."

(Letters to soviet leaders--Alexander solzhenitsyn London June, 1974, P-58)

এইভাবে আমরা বলতে পারি যে ভারতবর্ষের জাতীয় ধারা হচ্ছে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজী ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়— পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষ গুণ উভয়ই বর্তমান এবং মানুষ এই চারই ব্যবস্থার মধ্যেই শোষণ বা নিপীড়নের শিকার হয়। স্বামীজীর চোখে তাই শোষণ বা নিপীড়নের চারটি রূপ— (১) জ্ঞান বলে বা বুদ্ধি বলে বলীয়ানের অত্যাচার। (২) অস্ত্র শক্তিতে বলীয়ানের অত্যাচার। (৩) অর্থশক্তিতে সম্পদশালীর অত্যাচার। এবং (৪) কায়িক শ্রমের শক্তিতে অত্যাচার। স্বামীজীর মতে, এই চার রকম নিপীড়নই মানুষের স্বাধীন বিকাশের প্রতিবন্ধক এবং সেইজন্য এগুলির নিরাকরণ চাই। আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন : "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ— এইসবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৪)।

সুতরাং আদর্শরাষ্ট্র যেখানে মানুষের কর্ম হবে ভোগের জন্য নয়, তার প্রতিটি কাজই হবে পরের উদ্দেশে নিবেদিত, আর তা সম্ভব হবে স্বামীজীর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায়— যার মধ্যমণি মানুষ, মানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতা।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

যেমন গুরু তেমন শিষ্য

অর্ণব নাগ

হৃষীকেশের দিকে যেতে দুর্গম পাহাড়ি পথ। চড়াই-উতরাই বেয়ে লোটা-কম্বল কাঁধে পদব্রজে সেই পথের শরিক দুই সাধু। সাধু দু'জনেই বলিষ্ঠ যুবক। একজন গুরু, অন্যজন শিষ্য। মুশকিলটা হলো এসব পথে গুরু যতটা অভিজ্ঞ, শিষ্য নেহাতই সেখানে আনকোরা। শিষ্যটি ছিল ভাল, খাচ্ছিল-দাচ্ছিল, ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাতরাস স্টেশনে স্টেশনমাস্টারি করে দিব্যি সময়টা কেটে যাচ্ছিল। গোলমাল পাকাল ওই স্টেশনে অকস্মাৎ উপস্থিত এক যুবক সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর চোখে আশ্চর্য এক দ্যুতি দেখেছিল ওই স্টেশনমাস্টারটি। ঝোঁকের মাথায় সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পিছু নিয়েছিল সন্ন্যাসীটির। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সন্ন্যাসীর পরিব্রাজক জীবন কী জিনিস। না, আর

স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

স্বামী সদানন্দ

স্বামী কল্যাণানন্দ

চলতে পারছে না সে। বুটজোড়া যেন আধমণি পাথর বলে ভ্রম হয়। অগত্যা বুটজোড়া খুলে পুঁটুলির মধ্যেই নিয়ে নিল সে। এবার যদি চলা যায়! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। স্টেশনমাস্টারির সুখের চাকরি ছেড়ে চরকি-পাক ঘুরতে থাকা ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে জুতো থাকাও যা না থাকাও-তা। যাঁর ভরসায় এই কৃচ্ছ্রসাধন বিষয়টি তাঁর নজর এড়াল না। অনায়াসে শিষ্যের জুতো ভর্তি পুঁটুলিটাকে মাথায় তুলে বলিষ্ঠ শরীরে শিষ্যটিকে ধরে নিয়ে হৃষিকেশের পথে এগিয়ে চললেন সন্ন্যাসী।

এই সন্ন্যাসীর নামটি বলার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা রয়েছে। কারণ ইনিই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিশ্রুত হন। হাতরাসের স্টেশনমাস্টার যুবকটির সঙ্গে দেখা হবার সময় তিনি সম্ভবত, স্বামী বিবিদিষানন্দ। সে যাই হোক আদতে যে তিনি আমাদের প্রিয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই স্টেশন মাস্টারটি তাঁর প্রিয় ও প্রথম শিষ্য শরৎচন্দ্র গুপ্ত ওরফে স্বামী সদানন্দ। যাঁকে শিষ্য করার জন্য 'নরেন আবার চেলা করছে' গোছের গঞ্জনাও নেহাত কম সইতে হয়নি বিবেকানন্দকে। আর পরবর্তীকালে তাঁর কাছে আসা যুবকদের বলতেন সদানন্দ, 'ওরে তোদের মতো বিবেকানন্দের গ্ল্যামার দেখে আসিনি। এসেছি নরেন দত্তের প্রেমে পড়ে।' আর এই প্রেমে পড়েছিলেন বলেই নিঃসংকোচে স্বামীজীকে বলতে পেরেছিলেন, 'যেদিন আপনার চেয়েও বড় কাউকে দেখব, সেইদিনই আপনাকে ছেড়ে দেব'। বলাই বাহুল্য নিজের জীবনে স্বামীজী'র চেয়ে বড় সাধু আর দেখতে পাননি। তাই সন্ন্যাসীজীবনের চিরটাকাল স্বামীজীকে আশ্রয় করেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিজেকে 'স্বামীজীর কুকুর' বলতেও তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না।

১৯১১-র ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টেয় রামকৃষ্ণলোকে গমনের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়েছিল সামনের দেওয়ালে টাঙানো স্বামীজীর প্রতিকৃতির দিকে। তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন স্বামীজীর নাম, 'স্বামীজী, স্বামীজী স্বামীজী'। তারপর গুরুর সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা করেছিলেন অনন্তলোকের উদ্দেশ্যে। স্বামীজী'র এই শিষ্যটিই একবার দুর্ধর্ষ একটি ঘোড়াকে তার ওপর চড়ে এমন বশ করেছিলেন যে বিবেকানন্দকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, "সদানন্দবাবা, তুমিই আমার ঠিক ঠিক মরদ চেলা।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় স্বামীজীর এক সেপাই চ্যালার নাম। তিনি হলেন সূরয রাও। সৈনিক হিসেবে তিনি

ব্রহ্ম, শ্যামা, জিব্রালটার, মাল্টা প্রভৃতি দেশে ব্যাপক ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল পরিপূর্ণ। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কুম্ভকোনম থেকে একটা বিশেষ ট্রেনে স্বামীজী মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পাশ্চাত্য-বিজয়ের পর তাঁর এরকম যাত্রা স্বভাবতই লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠত। পথে মায়াবরম স্টেশনে বিস্ময়কর ভিড় দেখে ট্রেনের গার্ড সিদ্ধান্ত নিলেন একেবারে সোজা মাদ্রাজে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবেন। কিন্তু মায়াবরম থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত দীর্ঘপথে অপেক্ষমান জনতার অভাব নেই। এঁদের মধ্যেই ছিলেন সৈনিক সূরয রাও। ইতিপূর্বে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে রায়পুরে শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের নাম শুনেছিলেন তিনি। ফলে বিবেকানন্দকে দেখার একটা আলাদা আগ্রহ তাঁর আগাগোড়াই ছিল।

কিন্তু মাথায় বুঝি বাজ পড়ল। মাদ্রাজের আগে যে কোথাও আর থামবে না স্বামীজীকে নেওয়া রেলগাড়ি! কিন্তু সৈনিক মানুষটি অত সহজে দমবার পাত্র নন। প্রথমে গেলেন একটি অখ্যাত স্টেশনের ততোধিক অখ্যাত স্টেশনমাস্টারের কাছে, ট্রেন দাঁড় করানোর আর্জি নিয়ে। কিন্তু সে ক্ষমতা সেই স্টেশনমাস্টারের ছিল না। অগত্যা দর্শনার্থী জনতাকেই এককাট্টা করে অখ্যাত স্টেশনেই সেই বিখ্যাত মানুষটিকে নিয়ে দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলা ট্রেনটিকে থামিয়েই ফেললেন তিনি। তারপর সেই যে এক মুহূর্তের জন্য মিলল বহু প্রতীক্ষিত দর্শন। আর তাতেই ঝড় উঠল সূরযের হৃদয়ে। পায়ে হেঁটেই তিনি চললেন মাদ্রাজের পথে।

যেতে যেতে সমুদ্রতীরবর্তী জেলেদের ঘরে ঘরে দেখতে পেলেন সেগুলোতে সারি সারি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। তাঁর মনে হলো আজ নিশ্চয়ই এদের কোনও উৎসব রয়েছে। নইলে অন্ধকারের রাজ্যে এই আলোকমালা কেন? উৎসবে মাতোয়ারা একদল বালককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ এখানে কিসের উৎসব?' বালকেরা জবাব দিল, 'জানতা নহী, জগদগুরু আ গিয়া'? উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সূরয রাও। সত্যিই তো আজ মাদ্রাজ প্রদেশে বিশ্ববিজয়ী জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়েছে! সমুদ্রতীরে যে আলোকমালা তাঁকে চমৎকৃত করেছিল এই অপরিণত বালকবুদ্ধির জবাবে তাই যেন তাঁর হৃদয়ে অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে জ্বলতে লাগল। প্রথমে মাদ্রাজ, পরে কলকাতায় এসে সৈনিকের চাকরি ছেড়ে ঠাঁই নিলেন জগৎগুরুর পদতলে। সন্ন্যাস নাম হলো স্বামী নিশ্চয়ানন্দ।

গুরুর কথা নিশ্চয়ানন্দের কাছে কতটা বেদবাক্য ছিল, আজীবন নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছেন তিনি। একবার বেলুড় মঠে একটা গাভী কেনা হবে স্থির হলে এঁড়েদা (অধুনা যার নাম আড়িয়াদহ) থেকে সেটাকে আনার জন্য স্বামীজী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সহ স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও আরও একজনকে সেখানে পাঠালেন। নৌকায় যাওয়া, নৌকায় আসা। যাবার আগে বিবেকানন্দ নিশ্চয়ানন্দকে সতর্কবাণী দিলেন, ''গোরুর দড়িটা কিন্তু হাতে ধরে থাকবি। তাহলে পালাতে পারবে না।'' যাহোক, তখন বর্ষাকাল। উত্তাল জলস্রোতে মা গঙ্গা তখন ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছেন। এই অবস্থায় গোরুটাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা নৌকো চড়ে মঠে ফিরছেন। আচমকা গোরুটা ঝাঁপ দিল গঙ্গায়। নিশ্চয়ানন্দ গুরুর আদেশ মতো নিজের হাতেই গোরুর দড়িটা ধরে রেখেছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে তিনিও ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়। এরপর যা হলো সে আর কহতব্য নয়। রীতিমতো যমে-মানুষে টানাটানি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও গুরুবাক্য অমান্যি করার কথা মাথাতেই আনেননি নিশ্চয়ানন্দ। গোরুর খুঁটটা আগাগোড়া ধরেছিলেন ভয়ংকরী গঙ্গার উথাল-পাতাল স্রোতের মধ্যেও। শেষপর্যন্ত গুরুকৃপাতেই প্রাণে রক্ষা পেলেন তিনি এবং বলাই বাহুল্য গোরুটিও প্রাণে বেঁচেই অবতরণ করল সুদূর শালকিয়ার ঘাটে। এদিকে নির্ভয়ানন্দ ও অন্য সাধুটির মুখে সব শুনে মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন স্বামীজী। এখন গোরু হাতে করে নিশ্চয়ানন্দকে মঠে আসতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সেইসঙ্গে মৃদু তিরস্কারও করলেন, ''তুই মুর্খের মতো গোরুর জন্য জীবনটা দিতে যাচ্ছিলি!'' হাতজোড় করে শিষ্যের জবাব ছিল, 'আপনি গোরুর দড়িটা সর্বদা হাতে রাখতে বলেছিলেন, সেটা ছাড়ি কেমন করে?'

নিশ্চয়ানন্দের গুরুভক্তির আঁচ স্বামীজীর গুরুভাইদের ওপরও পড়েছিল। স্বামী তুরিয়ানন্দ কাশীতে থাকাকালীন তাঁর একটি 'সামান্য' চাদরের জন্য যে 'অসামান্য' বিক্রম দেখিয়েছিলেন নিশ্চয়ানন্দ তাতে তাঁকে বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্য বলে মেনে নিতে কোনও বাধা নেই। স্বামীজী অপ্রকট হলে তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শকেই ধ্যান-জ্ঞান করে হরিদ্বারের কাছে কনখলে একটি সেবাশ্রমে তাঁর গুরুভাই স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে তীর্থাতুর মানুষজনকে সেবা করেই জীবনের বাকি পর্বটা কাটিয়ে দেন। স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে স্বামী নিশ্চয়ানন্দের সাক্ষাৎকারটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কল্যাণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল দক্ষিণারঞ্জন গুহ। ১৮৯৮ সালে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাস নাম রাখেন কল্যাণানন্দ। একদিন স্বামীজী তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''আচ্ছা, ধর আমার কিছু টাকার দরকার। তার জন্য যদি তোকে চা-বাগানের কুলী হিসেবে বিক্রি করি— তোর আপত্তি নেই তো?'' বিনা বাক্যব্যয়ে সানন্দে রাজি হয়েছিলেন কল্যাণানন্দ! গুরুগত প্রাণ এই মানুষটি সামান্য গুরুসেবার সুযোগ পেলেই যেন কৃতার্থ হতেন।

স্বামীজী-ই একদিন কথাপ্রসঙ্গে কল্যাণানন্দকে বলেছিলেন, ''দেখ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস? তাঁদের দেখবার জন্য কেউ নেই। তুই গিয়ে তাঁদের সেবায় লেগে যা!'' গুরুবাক্যি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সুদীর্ঘ ৩৬ বছর জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এই

সেবাকার্যে লিপ্ত ছিলেন কল্যাণ মহারাজ। যখন নিশ্চয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁরা যে পরস্পর গুরুভাই একথা কেউই জানতেন না। কিন্তু ফুলের গন্ধ কখনও চাপা থাকে না। এঁদের পরস্পরের কথাতেই স্বামীজীর সুবাস বেরিয়ে পড়ল। এঁরা বুঝতে পারলেন তাঁরা সেই মহান গুরুরই শিষ্য যিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, ''যদি বড় কাজ কিছু নাও করতে পার— ভিক্ষে করে একটি পয়সা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি মাটির কলসী কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণার্ত পথিকদের জল দিও। তৃষ্ণাতুরকে জলপান করালেও মহৎ কাজ হবে।'' মূলতঃ এঁদের দু'জনের প্রচেষ্টাতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাকাজের ইতিহাসে কনখল সেবাশ্রমের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই স্মর্তব্য স্বামী অচলানন্দ ও স্বামী শুভানন্দের নাম। অচলানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কেদারনাথ মৌলিক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বহুমানিত কেদারবাবা। নিবাস বারাণসী। পুলিশে চাকরি করতেন। এঁরই এক বন্ধুর নাম চারুচন্দ্র দাস, উত্তরকালের স্বামী শুভানন্দ। চারুচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল স্বামীজীর আরেক শিষ্য, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শুদ্ধানন্দের। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় উদ্বোধন প্রকাশের পর শুদ্ধানন্দ চারুচন্দ্রকে তার কিছু গ্রাহক করার অনুরোধ করে কয়েকটি পত্রিকা দেন। উদ্বোধনের এই সংখ্যার প্রস্তাবনাটি লিখেছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। চারুচন্দ্র হরিনাথ নামে জনৈক বন্ধুর হাত দিয়ে ওই পত্রিকাটি পাঠান কেদারনাথের কাছে, সঙ্গে উদ্বোধনের গ্রাহক হবার সনির্বন্ধ অনুরোধ। পত্রিকাটি নেড়ে-চেড়ে স্পষ্টবাদী কেদারনাথ মুখের ওপর হরিনাথকে বলে দেন, 'না মশাই, সুবিধা হবে না। লেখকের যা কট্‌মটে ভাষা! কিছুই নেই ওতে!'

এই হলো স্বামীজীর শিষ্য। বিশ্ববিজয়ী বীরের লেখা হলেও ভাষাটা যখন খটমটে, তখন মুখের ওপর বলতে বাধাটা কোথায়? কিন্তু সব গুলিয়ে দিল বন্ধু চারুচন্দ্র। পরে আরেকদিন সে এমন করে পড়লে যে মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল! উদ্বোধনের গ্রাহক হলেন কেদারনাথ। পড়তে লাগলেন স্বামীজীর 'রাজযোগ'। স্বামীজীর সঙ্গে এঁদের পরিচয় হবে অনেক পরে। তার পূর্বে এঁরা স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের স্নেহের বশীভূত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখে বিহ্বল হলেন। এদিকে সংসার ঔদাসীন্য প্রদর্শন করায় কেদারবাবা বাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কাও খেলেন। ফলে সন্ন্যাসী হতে আর তাঁর বাধা থাকল না। তবে কর্মহীন

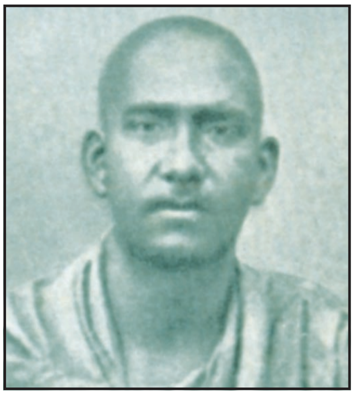

স্বামী অচলানন্দ

সন্ন্যাস নয়। গুরুকে তখনও অবধি তিনি কিংবা শুভানন্দ চাক্ষুষ না দেখলেও তাঁর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে চললেন। গড়ে উঠল কাশীর অনাথাশ্রম, যার সম্পর্কে বিবেকানন্দর মন্তব্য ছিল, ''এমন আশ্রম ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিৎ।''

তাঁর এই 'একলব্য' শিষ্যদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই সম্যক অবগত ছিলেন স্বামীজী। যে কারণে বলেছিলেন, ''ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার স্পিরিটে কিছু কাজ করছে।'' বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বরাবরই খুব আত্ম-প্রত্যয়ী ছিলেন। গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এনিয়ে একটি কালজয়ী উক্তিও করেছিলেন, ''বাবুরাম, আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলব। তা যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুরাদি সব মিথ্যা জানবি।'' বিবেকানন্দের এই বিশ্বাসের মর্যাদা যে তাঁর শিষ্যেরা সকলেই দিয়েছিলেন তা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত। সেই যে বয়স অল্প বলে তিনি যখন ঠাঁই পাচ্ছিলেন না মঠে, তখন নিজের হৃদয়ের কথাটা স্বামীজীর কাছে গানে গানে উজার করে দিয়েছিলেন তাঁর আরেক শিষ্য স্বামী পরমানন্দ (পূর্বাশ্রমে সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা), ''চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই। আমি সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই।''

আর স্বামীজীর এই টানেই তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন একঝাঁক যুবক যেমন সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী স্বরূপানন্দ), সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ), যুগলকিশোর শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ) ও আরও অনেকে যাঁদের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের জীবনের কথা লিখলে, গুরুপ্রেমের কথা তুলে ধরলে সেই গ্রন্থের কলেবর মহাভারতের আকার নেবে। ইতিহাসের এই দায় থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন স্বামী অব্জজানন্দ। 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে বিবেকানন্দের তেরোজন মহান সন্ন্যাসী- শিষ্যের জীবন-চরিত লিখে গিয়ে। এঁদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-নায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের জন্যই স্বামীজীর বাণী ও রচনার অনেক অমূল্য সম্পদ আমাদের করতলগত হয়েছে। স্বামী বিরজানন্দের লেখা চিঠিপত্রে স্বামীজীর ওজস্বী ভাষার প্রতিফলনই পরিলক্ষিত হয়। দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেও স্বীয় শিষ্যদের মধ্যে দিয়েই বেঁচেছিল স্বামী বিবেকানন্দের আত্মা। আপন সন্ন্যাসী শিষ্যদের কর্মে ও মর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক ভারতের দ্রোণাচার্য— স্বামী বিবেকানন্দ।

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155

CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

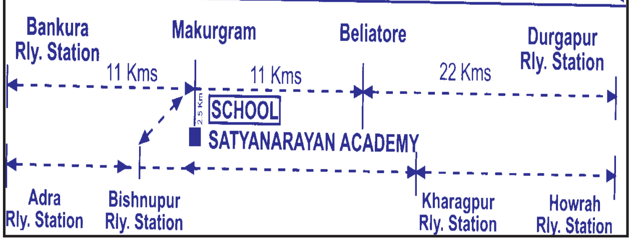

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

HB®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

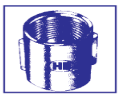

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

বিবেকানন্দ-র লেখা বই ও তাঁর সম্বন্ধে লেখা বই আমাদের গৌরবের উত্তরাধিকার

রমাপ্রসাদ দত্ত

'সময়ের বিচারে তাঁর বয়স হবে বছর তিরিশ, সভ্যতার বিচারে কয়েক শতাব্দী।' স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে এমন ধারণা প্রকাশ করেন বিদেশিনী মেরি টাপ্পান রাইট

১৮৯৩ সালের ২৯ আগস্ট। ১২০ বছর আগের কথা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পরিচয় প্রথম জোরালো ভাবে তুলে ধরেছেন এক সন্ন্যাসী। তখনও বিশ্বধর্মসম্মেলনে তিনি বক্তৃতা করেননি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যা লক্ষ্য করেছিলেন বিদেশের গুণগ্রাহীরা, তা হলো তাঁর মনন চিন্তনের বলিষ্ঠ প্রকাশ। তিনভাবে স্বামী বিবেকানন্দ তা অর্জন করেছিলেন। ১. নিবিড় এবং গভীর পাঠ। ২. অধীত বিদ্যা আত্মস্থ করা। ৩. নিজের অনুভব ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পাঠকে পূর্ণতা দেওয়া।

দুটো ভূমিকা তাঁর। লেখক এবং কথক। বিদেশে যখন বক্তৃতা করেছেন তখনকার সম্বল স্মৃতি আর বোধ। পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী বলার জন্যে দরকার সাহস আর আত্মবিশ্বাস। নিজেকে পুরোপুরি তৈরি রেখে তিনি বিদেশে গেছেন। এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। লোকশিক্ষকের ভূমিকা ছিল তাঁর। যুক্তি সাজিয়ে নিজের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এদেশের মানুষকে বলা একরকম। অন্যদেশের মানুষকে বলা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে থেকে বহু বিষয়ে পড়াশোনার অভ্যেস এবং প্রকৃত বিদ্যার যথাযথ অনুশীলনেই তিনি অধিকারী হয়েছিলেন ভারত আত্মাকে অনুভবের মাধ্যমে প্রকাশ করার। আত্মিক তাগিদ থেকেই তিনি জননায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'ওঠো জাগো'— এ মন্ত্র তো চিরকালের। তিনি তা নতুনভাবে বলেছেন লিখেছেন দেশ কাল সময় সমাজকে মনে রেখে।

বিবেকানন্দের জন্মের পঞ্চাশ বছর

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

পালন হয়েছে ১৯১৩ সালে। তখন তাঁর দুই ভাই ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ। মা ভুবনেশ্বরী দেবীর জীবনাবসান হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতাও মারা গেছেন দার্জিলিং-এ। রামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের বয়স তখন সবে পনেরো বছর। বিবেকানন্দের মৃত্যুর আগে মারা গেছেন জে জে গুডউইন। যিনি ১৮৯৫ থেকে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমার ডান হাত চলে গেল।' স্বামীজীর লেখার অনেকটা অংশই ইংরেজিতে। নিজে হাতে যত লিখেছেন তার থেকে বেশি বলেছেন এবং তা শর্টহ্যান্ডে ধরে রেখেছেন গুডউইন। স্বামীজীর বলার মধ্যে যেমন গতিময় সুস্পষ্ট ভাবের প্রকাশ, তেমনি লেখার মধ্যেও। স্বামীজীর ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ হয়েছে পরে বিভিন্নজনের হাতে। প্রথম প্রকাশিত বই 'কর্মযোগ'। ১৮৯৬। ইংরেজী লেখা। পরপর বেরিয়েছে রাজযোগ। জ্ঞানযোগ। ভক্তিযোগ।

স্বামীজী চিঠিপত্র নিজের হাতে লিখেছেন। আরও অনেক লেখা। তার থেকে বোঝা যায়, বলার কথা জোরালো ভঙ্গিতে যুক্তি সাজিয়ে বলার দক্ষতা তাঁর বরাবরই ছিল। সবই অর্জন করেছিলেন

শ্রম আর সাধনার মাধ্যমে। তাঁর সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে সংগ্রাম। লেখার সঙ্গে ছিলই। এক বিবেকানন্দের মধ্যে নানা বিবেকানন্দের সমাবেশ ঘটেছে— এটা বই পড়লেই বোঝা যায়।

তাঁর জন্মশতবর্ষের সময় রচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগ নেয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। বিবেকানন্দকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন— এমন অনেক মানুষ জীবিত ছিলেন সে সময়ে। তাঁরা স্মৃতিচারণ করেছেন। শতবার্ষিকীর আগে প্রয়াত হয়েছেন বিবেকানন্দের দুই ভাই মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁরা দুজনেই স্বামীজী সম্পর্কে বই লিখেছেন। বিবেকানন্দ চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আগ্রহ দেখা গেছে কিছু মানুষের মধ্যে। যাঁদের জন্ম বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে। অনেক বই পাওয়া গেছে তার ফলে। বিবেকান্দের জন্মের দেড়শো বছর পেরোল। তাঁকে দেখেছেন এমন কেউ জীবিত নেই। মানুষ থাকে না, কিন্তু তাঁর কাজ থাকে। বিবেকানন্দের লেখা রয়েছে। আর তাঁর সম্বন্ধে লেখা বইও রয়েছে। বিবেকানন্দ রচিত এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কিত বইয়ের চাহিদা বিভিন্ন স্তরের ও বয়সের পাঠকমহলে ক্রমশ বাড়ছে। এই জিজ্ঞাসাই জরুরি। কিছু বাণী মুখস্থ করা, জীবনের ঘটনাপঞ্জী মনে রাখা আর ছবি সাজিয়ে মালা দেওয়ার মধ্যে শ্রদ্ধার প্রকাশ হলেও নিবিড় পাঠ ছাড়া বিবেকানন্দকে জানা সম্ভব নয়।

জে জে গুডউইন

মেরী লুইজ বার্ক (সিস্টার গার্গী)

বিবেকানন্দ রচিত বিভিন্ন বই প্রকাশ ও বিপণনের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। উদ্বোধন ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থা বই প্রকাশ করছে ধারাবাহিকভাবে। ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছরেই। বিবেকানন্দ সম্পর্কে লেখা সব বই সবসময় পাওয়া না গেলেও এখনও অনেক বইই ক্রয়লভ্য বলা যায়। স্বামীজীকে ঠিকভাবে জানার জন্যে তাঁর লেখা পড়তে হবে— একথা মানার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে তাঁর সম্বন্ধে লেখা কিছু বইপড়াও জরুরি। কারণ স্বামীজীর বহুমুখী কাজ এবং তাঁর ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয়ের জন্যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ জরুরি।

আমরা লক্ষ্য করেছি বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বই প্রতিবছর বেরোচ্ছে। এই চর্চার প্রয়োজন আছে। তবে আমাদের প্রত্যেকেরই তো সময় খুবই সীমিত। সেজন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই অবশ্য পাঠ বা জরুরি পাঠ তালিকায় রাখা যেতে পারে। সেরকম কয়েকটি বই হাতের নাগালে রাখা যায়।

বিবেকানন্দ রচিত ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা ১১৮। বাংলা বইয়ের সংখ্যা ৪— ১. পরিব্রাজক, ২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ৩. ভাববার কথা এবং ৪. বর্তমান ভারত। এছাড়া বাংলায় লেখা কিছু গান ও চিঠিপত্র রয়েছে। 'বাণী ও রচনা' বই পাওয়া যায়। তাছাড়া আলাদাভাবে বিভিন্ন বই সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। বিবেকানন্দের রচনা কপিরাইট মুক্ত হয়েছে অনেক বছর আগে। কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাইরের প্রকাশন সংস্থারা প্রকাশে আগ্রহী হননি। কারণ যে দামে বই পাওয়া যায় ওই দামে বই ছেপে বেঁধে সাধারণ প্রকাশকের পক্ষে বাজারে পাঠানো কঠিন। মিশনের বিপণন পদ্ধতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি বইপাড়ার প্রকাশন সংস্থা। অন্তত বলা যায় পাঠকরা চান বিবেকানন্দের বই বিক্রি হোক সেখান থেকেই, যেখানে থাকবে যত্ন। কম দামে উন্নতমানের প্রকাশন।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এমন কয়েকটি বইয়ের নাম :

১. স্বামী বিবেকানন্দ : প্রফেট-পেট্রিয়ট।। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
২. বিবেকানন্দ : দ্য সোস্যালিস্ট।। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩. লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ।। মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪. স্বামী বিবেকানন্দ।। প্রমথনাথ বসু।
৫. দি মাস্টার অ্যাজ আই শ হিম।। সিস্টার নিবেদিতা।
৬. যুগনায়ক বিবেকানন্দ।। স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৭. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ।। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত।
৮. বীরেশ্বর বিবেকানন্দ।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
৯. বিবেকানন্দ চরিত।। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
১০. দি লাইফ অফ বিবেকানন্দ অ্যান্ড দি ইউনিভার্সাল গসপেল।। রোঁম্যা রোঁলা।
১১. যুগদিশারী বিবেকানন্দ।। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (স)।
১২. বিবেকানন্দের কথা ও গল্প।। স্বামী প্রেমঘনানন্দ।
১৩. স্মৃতির আলোয় স্বামীজী।। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (স)।
১৪. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৭ম খণ্ড)।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

১৫. বিবেকানন্দ শরণে বিদেশিনী।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
১৬. বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
১৭. স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইয়ুথ।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
১৮. বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজ পেপারস (১৮৯৩-১৯০৩)।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ।
১৯. দ্য ইকনমিক পলিসি অফ স্বামী বিবেকানন্দ।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
২০. বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য।। প্রণবরঞ্জন ঘোষ।
২১. বিশ্ববিবেক।। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত।
২২. অচেনা বিবেকানন্দ।। শঙ্কর।
২৩. বন্ধু বিবেকানন্দ।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
২৪. শরবিদ্ধ বিবেকানন্দ।। দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত।
২৫. বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা।। অমিয়কুমার মজুমদার।
২৬. বিবেকানন্দ : প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ।। নিমাইসাধন বসু।
২৭. দি লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ।। বাই হিজ ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপেলস্।
২৮. এ কমপ্রিহেনসিভ বায়োগ্রাফি অফ স্বামী বিবেকানন্দ।। শৈলেন্দ্রনাথ ধর।
২৯. রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামী বিবেকানন্দ।। ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অ্যাডমায়ারস।
৩০. স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা : নিউ ডিসকভারিস।। মেরী লুইজ বার্ক।
৩১. দি কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ (৮ খণ্ড)।
৩২. স্বামী বিবেকানন্দ প্রফেট অফ দি মডার্ন এজ।। মেরী লুইজ বার্ক।
৩৩. শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী।। মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৪. শাশ্বত বিবেকানন্দ।। নিমাইসাধন বসু (স)।
৩৫. স্বামী বিবেকানন্দ।। মানদাশংকর দাশগুপ্ত।
৩৬. পরিব্রাজক বিবেকানন্দ।। প্রবাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
৩৭. স্বামী বিবেকানন্দ নতুন তথ্য নতুন আলো।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৩৮. সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু।। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩৯. বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা।। প্রণবেশ চক্রবর্তী।
৪০. যুক্তিবাদী বিবেকানন্দ।। মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত।
৪১. নরেন্দ্রনাথ হইতে বিবেকানন্দ।। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
৪২. দি ফিলজফি অফ বিবেকানন্দ অ্যান্ড দি ফিউচার অফ ম্যান।। জি সি দেব।
৪৩. বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা।। তামসরঞ্জন রায়।
৪৪. বিবেকানন্দ অ্যান্ড হিজ ওয়ার্কস।। স্বামী অভেদানন্দ।
৪৫. বিবেকানন্দ : সাহিত্য ও সমাজচিন্তা।। হরপ্রসাদ মিত্র।
৪৬. ভক্ত বিবেকানন্দ।। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
৪৭. বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।। মোহিতলাল মজুমদার।
৪৮. রাইজিং কল টু দি হিন্দু নেশন।। একনাথ রানাডে সম্পাদিত।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
Chicken Mutton
DUTA
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Turmeric Powder
SUPER Cumin Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
7 January - 2013

দাম : ৭.০০ টাকা